পরিবর্তন

১৬ এপরিল ১৯৮০



ালক ব্রহ্মচারী কি
চৈতন্যের অবতার?



পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্ক্যান ঃ সৌম্য ভৌমিক

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com


এক-চক্ষু জলদস্যু
মূল কাহিনী : রবিদাস সাহারায়
চিত্র কাহিনী : অলোক দত্ত
শিল্পী : পোলারিস
১৪
যে ফল ছুঁড়ে মেরেছিল পাকা ফলের মত সে খসে পড়ল ।
বেয়াদপি না করে নেডকে আমার কেবিনে পাঠিয়ে দাও ।
সর্দার চলে যেতে একজন গিয়ে নেডের বাঁধন খুলে দিল ।
নেড এসে ঢুকল কেবিনে । ক্যাপ্টেন সউপ তখন একটি মানচিত্র দেখছিল । পাশে একজন দস্যু ।
টার্ক ীপের সেই হাটায় এবারের লুটের মাল আমরা রেখে দেব ।
সেটাই ভাল হবে সর্দার ।
একসময় দস্যু-নায়ক নেডকে দেখতে পেল ।
আমরা যে জাহাজ লুট করেছি তুমি কি তার মালিকের ছেলে ?
(ক্রমশঃ)

সম্পাদকীয়

ষাটের দশকের শুরুতে অন্ধ্রপ্রদেশের কানচি করচেলায় তামার বাসনপত্র চুরি করার অপরাধে একটি হরিজন শিশুকে গাছের সঙ্গে বেঁধে পুড়িয়ে মারা হয়। এর আগেও আমাদের এই 'অতি-সুপ্রাচীন' দেশে বর্ণহিন্দুদের হাতে হরিজনরা খুন হয়েছে, কিন্তু তার খবর বাইরে আসেনি। কানচি করচেলাই প্রথম স্বাধীনতা-পরবর্তীকালের ভারতবর্ষে প্রমাণ করল—এ স্বাধীনতা কেবল বর্ণহিন্দুদের স্বাধীনতা : হরিজন হিসাবে যারা এদেশে জন্মেছে তাদের যেন কোন স্বাধিকার থাকতেই পারে না। গ্রামকে গ্রাম জুড়ে বর্ণহিন্দুরা হয়ে দাঁড়াল শাসক এবং হরিজনরা শোষিত। এই শোষিত জীবনধারায় কোন পরিবর্তনই আসেনি।

দক্ষিণ ভারত থেকে বিন্ধ্য পর্বত পেরিয়ে এই অত্যাচারের হুঙ্কার ও অত্যাচারিতের কান্না ছড়িয়ে পড়ল উত্তরেও, বিশেষত হিন্দি-ভাষী রাজ্যগুলিতে।

১৯৭৭ সালে বিহারের বেলচি গ্রামে একটি হরিজন বস্তির ওপর সশস্ত্র আক্রমণ চালাল তথাকথিত উচ্চবর্ণের হিন্দুরা। তারপর এই সেদিন একই ঘটনা ঘটেছে একই রাজ্যের পিপরা গ্রামে। এর মাঝখানে ঘটে গেছে ধরমপুরা, বেগুসরাই, বিহারশরীফ, বিক্রমপুর, বাজিতপুর, পরশবিঘা এবং দোহিয়ার হরিজন নিধন।

রাষ্ট্রসংঘ মানবাধিকার কমিশন সম্প্রতি এক রিপোরটে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মানবিক অধিকার লঙ্ঘনের তীব্র নিন্দা করেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষে মানবিক অধিকার যথাযথ রক্ষিত হচ্ছে বলে এদেশের প্রশংসা করা হয়েছে মুক্তকণ্ঠে।

রাষ্ট্রসংঘ বাইরে থেকে এখানে মানবাধিকার সুরক্ষিত হতে দেখছেন, কিন্তু ভেতর থেকে ভারতবাসী দেখেন তার বিপরীত ঘটনাবলী। যখন পিপরা বা পরশবিঘা, দোহিয়ায় হরিজন হত্যার ঘটনা চোখে পড়ে, তখন মনে হয় এ প্রশংসা ব্যঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নয়।

রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত নিয়মবিধিতে উল্লেখ আছে, যে কোন সংঘর্ষ বা সংঘাতই হোক না কেন নারী ও শিশুদের সেই ধ্বংসলীলা থেকে রেহাই দিতে হবে। হিটলারের পতন ছিল অনিবার্য, কারণ ইহুদি হত্যাযজ্ঞে তিনি নারী বা শিশুকেও ক্ষমা করেননি। আজ যারা একই দেশের সাধারণ, তথাকথিত নিম্নবর্ণের 'অচ্ছুৎ' মানুষকে স্বগ্রামে তিষ্ঠোতে দেয় না, তাড়িয়ে বেড়ায় গরু ভেড়ার মত, তারাও সেই নিম্নবর্ণের শিশু ও নারীকে পর্যন্ত রেহাই দিচ্ছে না।

প্রত্যেকটি মানব সম্প্রদায়ই পৃথিবীর যে কোনো স্থানে বাস করার সম্পূর্ণ অধিকারী। এবং ভারতের সংবিধানও নিজভূমির ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ স্বীকার করেছে। কিন্তু হরিজনরা পড়তে জানে না, ফলে স্বাভাবিকভাবে তারা সংবিধানও পড়তে জানে না। হয়তো জানে না—ঐ নামে কোন এল্টি রক্ষাকবচ নির্মাণের ব্যাপারে তাদেরই অগ্রপুরুষ আম্বেদকর আমৃত্যু পরিশ্রম করেছিলেন।

হরিজনরা সম্ভবত এই কথাটাই শুধু জানে, বর্ণহিন্দুরাই পুলিশ, ম্যাজিসট্রেট হয়, তারাই জন্ম থেকে জোতদার, এম এল এ, এম পি হয়। ফলে মানসিক ও শারীরিক কোন সুযোগই বর্ণহিন্দুদের চেয়েও অধিকতর ভারতীয়দের নেই।

তাহলে কি এরকমই চলতে থাকবে? এই শিশুর চিৎকার, নারীর লাঞ্ছনা ও কান্না, পুরুষের আত্মগোপন, আগুনে পোড়া স্তূপীকৃত ঝুপড়ি এবং কালো কালো মানুষের একসার মৃত্যু-মিছিল?

কেন? জন্মের দোহাই দিয়ে যারা তালেবর সাজতে চায় তারা হয় অন্যের জমি অন্যায় ভাবে দখল করতে চায়, না হয় রাজনৈতিক ফয়দা লুটতে চায়। কিন্তু প্রশাসন ও সরকারি যন্ত্রের তো এমন কোন বদ-ইচ্ছা থাকার কথা নয়।

অবশ্য তাই বা বলা যায় কি করে? এরকম যখন নির্বিবাদে চলেই যাচ্ছে তখন সন্দেহ উঁকি মারে ঐ জমি চোর আর রাজনৈতিক 'বস'রাই হয়তো প্রশাসন চালায়, নিয়ন্ত্রণ করে যাবতীয় সরকারি যন্ত্রের গোপন চাবিকাঠি।

পরিবর্তন

১৬ এপরিল ১৯৮০
দ্বিতীয় বর্ষ, বিংশ সংখ্যা
প্রতি সংখ্যা ১.৫০

বিমান মাশুল ঃ পূর্বাঞ্চলে ২০ পয়সা ভারতের অন্যান্য স্থানে ২৫ পয়সা





সম্পাদক : অশোক চৌধুরী
সংযুক্ত সম্পাদক : ধীরেন দেবনাথ
শিল্প-নির্দেশক : নিতাই ঘোষ

এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ নিতাই ঘোষ ● প্রচ্ছদ আলোকচিত্র ঃ দীপক ভট্টাচার্য

সমীপেষু

প্রেম প্রেম খেলা ঃ একপেশে সিদ্ধান্ত

'প্রেম প্রেম খেলা বন্ধ হোক' গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়লাম। পড়ে মনে হল আপনারা একতরফা সিদ্ধান্তই নিতে চলেছেন। সন্দেহ নেই স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের নৈতিক মান ক্রমশ নিম্নগামী, কিন্তু তার মূলে এই প্রেম প্রেম খেলা নয়। পারকে, ময়দানে বা সদৃশ স্থানগুলোতে যে জোড়া জোড়া প্রেম দৃষ্ট হয় তার সবগুলোই কিন্তু খেলা নয়। ওই খেলাই অনেককে বেঁচে থাকার প্রেরণা বা আশাসঞ্জীবনীটুকুও জোগায়। লক্ষ্য করে দেখবেন, তুলনা করে দেখবেন—ভারতীয় তরুণ-তরুণীরা স্বাস্থ্য সৌন্দর্যের দিক থেকে, সজীবতার দিক থেকে পাশ্চাত্য তরুণ-তরুণীদের থেকে অনেক পেছনে। এদেশে 'মংসানি বড়চাস্তি' কিন্তু 'গঞ্জেরা ন বড়চাতি' —সংসার, সমাজ, স্কুল, কলেজের রক্তচক্ষু অভিভাবকদের দৃষ্টির মধ্য দিয়ে মনের যথার্থ বিকাশ ও প্রসার হয় না। ফলে ব্যাধিহীন নীরোগ উজ্জ্বল কর্মঠ স্বাস্থ্যও গড়ে ওঠে না। তাই পঁচিশ পেরোলেই আমরা (আমরাই ভারতবর্ষ) ধুঁকতে শুরু করি—বুড়িয়ে যাই।

আমাদের দেশের নিম্ন মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত ফ্যামিলির শিক্ষিত আধাশিক্ষিত তরুণ-তরুণীর জীবনের সোনার দিনগুলো কাটে বাৎতায়, আক্ষেপে, নৈরাশ্যে। সাধ-আহ্লাদ তাদেরও আছে। তারাও চান opposite sex-এর বেদনহর উষ্ণ সান্নিধ্য, স্পর্শমাধুর্য এবং বসন্তের পলাশরাঙা আমন্ত্রণ। আর তা পেতে হলে যেতে হয় পরিবার, সংসার ও পরিচিত সমাজের বাইরে মুক্ত পৃথিবীতে। দৈনন্দিন জীবনের অবক্ষয় থেকে ওরা চায় একটু মুক্তি, একটু শান্তি—হতে চায় সুস্থ সবল ও সজীব। এতে বাদ সাধা কেন? এটা মোটেই দেশের জলন্ত সমস্যা নয়। আরো বহু বহু সমস্যা, বলা যায় সমস্যার হিমালয় জমে আছে এই পোড়া দেশে। সেদিকেই দৃষ্টি দেওয়া, সমাধান করা আশু প্রয়োজন। প্রকৃতিকে, বায়োলজিকে একটু সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত হতে দিন, তা না হলে সমাজদেহ আরো ক্ষতবিক্ষত হবেই। সদর্থেই অবৈধ ও ক্লেদাক্ত সম্পর্কের প্রাদুর্ভাব দেখা দেবে সংসারে সমাজে সর্বত্র। তাতেই পরিণতি ভয়াবহ হবার অধিক সম্ভাবনা। অবশ্য স্বাধীন, সার্বভৌম অভিসারের মানেই এই নয় স্থানকালপাত্র জ্ঞানশূন্য হয়ে যদৃচ্ছ আচরণ কিংবা অশিষ্টতা, অশালীনতা। শালীনতার মধ্য দিয়েও প্রেম হয়, বোঝাপড়া হয়। পুলিশের দৌরাত্ম্যও জোর করে বন্ধ করতে হবে। উচিত কয়েকটা পারক বা উদ্যানকে বিশেষরূপে Lovers' Park রূপে চিহ্নিত করা। সমাজ ও দেশের কাছে তরুণ-তরুণীরা এটুকু বদান্যতা অন্তত চান। আর আমরাও চাই বেডসীন যেন দৃশ্যায়িত না হয় অজস্র খোলা চক্ষুর সম্মুখে। এ পৃথিবীতে সৌন্দর্য ও সামঞ্জস্যবোধ যত কমছে তত তার পুনরুদ্ধারে আমরা প্রত্যেকেই কেন যত্নবান ও যত্নবতী হই না?

মার্নি রঞ্জন সেনগুপ্ত, ভাঙাবাজার, কাছাড়

কুকুরে প্রেম

এখনকার অধিকাংশ প্রেমই কুকুরে প্রেম, দেহের প্রেম। এ প্রেম মনের প্রেম নয়। এ প্রেমে কোনো পবিত্রতা নেই, নেই আন্তরিক ভালবাসা। যৌন ক্ষুধা মেটানোর জন্যই এ প্রেম। তাই এই জঘন্য, নোংরা প্রেমের নেই কোনো আশীর্বাদ আছে শুধু অভিশাপ আর কুফল।

এই প্রেম খেলার জন্যই দেশে অবৈধ গর্ভপাতের হার দ্রুত বেড়ে চলেছে। এই প্রেমের ফলে যে নবজাতকের সৃষ্টি হচ্ছে, বলতে পারেন তার কি দোষ? নিজেদের মান-সম্মান রক্ষার্থে এই নূতন শিশুটিকে নষ্ট করে ফেলা হচ্ছে। কে বলতে পারে এই নিষ্পাপ শিশুটি একজন মহাপুরুষ হতে পারত না!

মেয়েদের বেশ্যাবৃত্তি এবং 'পুরুষদের বিপথে যাওয়ার জন্যও এই 'প্রেম প্রেম খেলা' সম্পূর্ণরূপেই দায়ী। এ প্রেম ক্ষণস্থায়ী। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই প্রেমের পরিণতি বিবাহে নয়। কয়েকটা দিন আনন্দ, স্ফূর্তির জন্যই এ প্রেম। এরা 'প্রেম প্রেম খেলায়' এমন ভাবে মেতে উঠেন যে, ভারসাম্যটুকুও হারিয়ে ফেলেন। এই ধরনের যুবক-যুবতীরা দু-এক ঘাটে নয়, বহু ঘাটেই জল খেয়ে থাকেন। এই ধরনের যুবতীরা বহু যুবকের সঙ্গে আনন্দ-স্ফূর্তি করতে করতে শেষ পর্যন্ত কোনো যুবকের হাতে গিয়ে পড়েন, যে তার যথাসর্বস্বই লুট করে নেয়। ফলে তখন তাকে বাধ্য হয়েই বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করতে হয়। পুরুষরাও বহু স্থানে ল্যাঙ খেতে খেতে শেষ পর্যন্ত মানসিকভাবে খুব দুর্বল হয়ে পড়ে। এবং তখন এরা অনেকেই সমাজের নোংরা পথটাকেই বেছে নেয়। এইভাবেই যুবসমাজ আজ ভেসে যাচ্ছে।

প্রেম প্রেম খেলার ফলে পরিবারেও নানাবিধ অশান্তির সৃষ্টি হয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ পরিবারের অবস্থাই অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিশেষ সচ্ছল নয়। ফলে স্বভাবতই পরিবারের লোকেরা তাদের বয়স্ক সন্তানদের উপর অনেক কিছুই আশা করে থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, এরা মা-বাবার আশা পূরণ না করে, এই প্রেম খেলায় মেতে উঠেন। এমন অনেক পরিবার আছে যে পরিবারে দিনের পর দিন খাওয়া হয় না। সেই পরিবারেরই কোনো যুবক ছেলে যদি কাজের পরিবর্তে এই খেলায় লিপ্ত হন, তাহলে সেই পরিবারের অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা সহজেই অনুমেয়।

এদের দাম্পত্য জীবনও সুখের হয় না। এই সব যুবক-যুবতীরা চিরকাল সাধারণত খেলাই করে। বিয়ে করে না বললেই চলে। দু-চারজন এইভাবে বিয়ে করে, কিন্তু তাদের দাম্পত্য জীবন কখনোই সুখের হয় না।

এই 'কুকুরে' প্রেমের জন্য আধুনিক যুগের যুবক-যুবতীদের রুচিবোধ যে কোথায় নেমে গেছে তা এরা নিজেরাই জানে না। পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করানোর জন্য এরা অত্যন্ত নোংরা ধরনের সব সাজপোশাক পরে।

বিজিত ঘোষ, বসিরহাট, নূতনবাজার

না তাকানোই ভালো

'প্রেম প্রেম খেলা বন্ধ হোক' শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়ে একটু চমক লাগল। যে সব তরুণ-তরুণীদের কথা লেখা হয়েছে, যাদের ভিকটোরিয়া, ইডেন, লেক বা বোটানিকসে দেখা যায় তারা কারু পাকা ধানে মই দিয়েছেন বলে মনে তো হয় না। বছর পনের আগে পুলিশ কিছু কিছু ধরপাকড় করত তাও অনেক রাতে দেখলে তবেই। কিন্তু তাও বোধহয় উঠে গিয়েছে অথবা উঠিয়ে দিতে হয়েছে। তরুণ-তরুণীদের মনের এটা একটা 'আউটলেট' এইভাবে সাক্ষাৎ করা—পশ্চিম দেশে যাকে বলে 'ফ্রি মিক্সিং'। বন্ধ করে দিলে অর্থাৎ জোর করে দাবিয়ে রাখলে তার ফল কখনই ভাল হবে বলে মনে হয় না। তখন এদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেবে আর সেই বারুদের স্তূপ ফেটে সমস্ত সমাজকে তোলপাড় করে দিতে পারে। কাজেই বয়স্কদের ওসব দিকে তাকিয়েও না তাকানোর ভান করা অথবা একেবারেই সোজাসুজি না তাকানো ভাল।

যে প্রেম পরীক্ষার পরও টিঁকে থাকে সেটাই সত্যিকারের ভালবাসা—এটা অনেকেই বলবেন। কিন্তু যে প্রেমের খেলা শুধু খেলাতেই সীমাবদ্ধ রইল, টিঁকল না—তার দামও কম নয় কারণ এর দ্বারা তরুণ-তরুণী যে অভিজ্ঞতা লাভ করলেন তার সাহায্যে কিছু একটা তাদের শেখা হয়ে গেল।

বিনয়ভূষণ দাস, সোদপুর

ক্ষতি কী ?

'প্রেম প্রেম খেলা বন্ধ হোক' ও 'প্রেমিকার সঙ্গে ভিকটোরিয়ায়' পড়লাম। কিন্তু লেখকদের বক্তব্য মেনে নিতে পারলাম না। একান্তই না। পারা যায় না যে। যৌবন-বিগতপ্রায় আমরা পারব না এই খেলা বন্ধ করতে। অবশ্য আমাদের কাছে এ তো খেলা নয়—লীলা।

জীবনের সবটুকু খুশী কি হারাতে হবে? অর্থ, যশ, প্রতিপত্তি কিছুই তো পেলাম না। বিষয় জীবনের বিকৃত বেদীমূলে শেষ পর্যন্ত প্রসঙ্গ প্রিয়সঙ্গ ও আসঙ্গও কি আমাদের জন্য অবশেষ থাকবে না? তবে আমরা কি নিয়ে বাঁচব বলুন? যৌবনের সফেন সমুদ্রে মনে যদি রঙ না ধরে, রোমানটিকতা না আসে, বিপরীত মেরুর প্রতি পরস্পরের আকর্ষণ অনুভূত না হয় তবে সে তো—পূর্ণ পুরুষ বা নারী নয়। নপুংসক। ব্যর্থ তার জীবন-যৌবন।

আজকাল মধুর যৌবনবেলা প্রায় নিরর্থ কাটে। পরবর্তী ধূসর জীবনের প্রহর প্রপাতের পূর্বে করলাম না হয় একটু প্রেম, মিষ্টি মিষ্টি ফষ্টিনষ্টি,—তাতে ক্ষতি কি? যৌবনের সদব্যবহার তো হবে তাতে অন্তত। আনন্দ তো মিলবে কিছু। হোক সাময়িক, তবু তো সংকট সমুদ্রের মূল্যবান মুক্তি স্বরূপ চিহ্নিত হয়ে রইল। স্বাদ পাওয়া গেল যৌবনের, আনন্দও। কিন্তু জীবনের নানা সমস্যার সমাধান করতে করতে যদি মধুর যৌবন-যুগ কেটে যায় তবে এই দুর্লভ যৌবনের মৌ পান করব কবে?

যৌবনের উষ্ণতা থাকতে থাকতে জৈবিক সাধ আহ্লাদ মিটিয়ে নেওয়াই শ্রেয়। যৌবন তো ক্ষণস্থায়ী—অথচ সারা জীবনের আনন্দ-নিবিড় একখণ্ড স্বল্পায়ু সতেজ সময়। এ সময়ের উষ্ণতাকে অস্বীকার করা যায় না। উচিত নয়। ওঁরা (লেখকদ্বয়) কি করে যে অস্বীকার করতে পারলেন তা ভেবে পেলাম না। বোধহয় প্রেমের প্রসাদ থেকে বঞ্চিত।

আঙুরফল টক বললেই তাই আমরা মেনে নিতে পারি না। পারব না। নেব না।

সর্বাণী মুখোপাধ্যায়, পাপিয়া ঘোষ, ভবদেব বিশ্বাস, সুমিত বন্দ্যোপাধ্যায়,
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলা বিভাগ, এম এ

একটি ঘটনা

আমি বর্তমান যুবসমাজের একজন হয়েও বলছি প্রেম থাকুক, কিন্তু প্রেম প্রেম খেলা বন্ধ হোক। প্রেমের মত পবিত্র বস্তু সকল যুবক-যুবতী ও সকলের মধ্যে সুন্দর ও সুস্থ ভাবে গড়ে উঠুক এই প্রত্যাশা আমরা সকলেই করি। কিন্তু প্রেমের নামে বেলেল্লাপনা অর্থাৎ প্রেমের ধুয়ো ধরে কামনার পশুপ্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করা, সেই প্রেম যেন না আসে। বর্তমানে আমাদের যুবসমাজের অধিকাংশ যুবক-যুবতীরা প্রেমের নাম নিয়ে কামনার শিকার হচ্ছে। নিজের দেখা এক অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে গেল।

আশ্বিনের একটি দিনে আমি ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল দেখতে গেছি হঠাৎ বৃষ্টি আসায় ফিরতে পারছি না। বৃষ্টি কিছুটা কমে আসতে দেখলাম এক ১৬/১৭ বছরের যুবতী তার দুই বয়ফ্রেনডের সঙ্গে ভিজতে ভিজতে ভিকটোরিয়ার সামনেটায় এসে দাঁড়াল। যুবতীটির পরণে বেলবটস, মিহি কাপড়ের শারট—বৃষ্টিতে শারট ভিজে যাওয়ার জন্য ব্রেসিয়ারের রেখা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। ওরা এসে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। হাসছিলও। হঠাৎ ওদের দিকে চোখ পড়তে দেখলাম, মেয়েটি তার এক বয়ফ্রেনডের একখানি হাত তুলে ধরে নিজের পয়োধর যুগলে চাপ দিচ্ছে আর বলছে, ইস, তোমরা চলে এলে, বৃষ্টিতে আর একটু ভিজলে কি enjoy না হত। আমি কেন, অনেকেই হয়ত এ দৃশ্য দেখছিলেন। কিন্তু ওরা নিজেদের মধ্যে শালীনতা বজায় রাখার চেষ্টা করলেন না।

প্রেম বন্ধ হোক সেটা আমরা কেউ চাই না। প্রেম প্রত্যেকের জীবনে শাশ্বত ভাবে প্রস্ফুটিত হোক এই কামনা প্রত্যেক সুধীজনের। তাই আমরা চাই প্রেম আসুক, জোড়ায় জোড়ায় প্রেমিক প্রেমিকার সৃষ্টি হোক। মাঠে, ময়দানে, পারকে শালীনতাবোধ রেখে ঘুরে বেড়াক। তারা বৃষ্টিতে ভিজে মজা পাক, পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাতে ভেসে যাক অথবা শীতের মিঠে রোদের মত তাদেরও প্রেম মিষ্টি হোক কামনা করি।

সৎ চিন্তা নিয়ে নিজেরা গড়ে উঠলে আমরা কিছুদিনের মধ্যে সুস্থ সমাজের গৌরবে গর্বিত হয়ে উঠব। এবং আমাদের প্রৌঢ়দের একচেটিয়া কটূক্তি "আজকালের ছেলেমেয়েরা বয়ে গেছে" শুনতে হবে না।

শিশিরকুমার সামন্ত, কুমর আড়া, মেদিনীপুর

অন্য খেলা চাই

আপনারা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় আলোচনা শুরু করেছেন, তার জন্য ধন্যবাদ।

এই মানসিক অবক্ষয় এবং নৈতিক অধঃপতনের জন্য অনেকে অনেক কারণ

দেখিয়েছেন। পূর্ববর্তী প্রজন্মের প্রতি অবজ্ঞা, সামাজিক নিরাপত্তার অভাববোধ ইত্যাদি অনেক কারণ রয়েছে নিশ্চয়ই, কিন্তু প্রধান কারণ আমার মনে হয় আমাদের জীবন থেকে খেলাধূলা বা sports-এর নির্বাসন। খেলাধূলা বলতে আমি মাঠে খেলা দেখতে যাওয়া এবং ফেরার সময় বাসে ট্রামে অসভ্যতা করা বা সারাদিন ক্রিকেট খেলার রীলে শোনা বা টি ভি দেখা বোঝাতে চাইছি না। আমি বোঝাতে চাইছি প্রকৃতপক্ষে খেলাধূলায় অংশগ্রহণ। এটাও লক্ষণীয় যে খেলার মাঠের সংখ্যা আশ্চর্যজনকভাবে কমে যাচ্ছে। ছেলেমেয়েরা রাস্তায়, বাড়ির ছাদে খেলতে বাধ্য হচ্ছে। অনেক জায়গায় সে সুযোগও নেই। আগে প্রতি অঞ্চলেই স্পোর্টিং, ব্রতচারী, [illegible] ইত্যাদির সংগঠন দেখা যেত। ইদানীং সেগুলি প্রায় নিশ্চিহ্ন বলা যায়। কিন্তু সমাজ জীবনে, বিশেষ করে বালক এবং কিশোর জীবনের ওপর এদের প্রভাব অপরিসীম এবং অনস্বীকার্য। যে বিপ্লব, [illegible] সংস্কৃতি সবগুলি ক্ষেত্রেই যে বাংলার একদা শ্রেষ্ঠত্ব ছিল তার মূলে এই ধরনের সংগঠনগুলির অবদান প্রচুর। স্বাস্থ্যোন্নয়ন, নৈতিক চরিত্রের উন্নয়ন, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি সম্মান প্রভৃতি সবগুলি সম্পদের প্রতি আকর্ষণ বাড়াতে এগুলি বহুল পরিমাণে সহায়তা করেছে। এই সব সংগঠনের অবলুপ্তি নিঃসন্দেহে আমাদের সমাজ জীবনের বিরাট ক্ষতির কারণ হয়েছে।

আরো একটা বড় কথা, ছেলেমেয়েরা যদি অবসর সময় খেলাধূলায় ব্যস্ত থাকে, অন্যদিকে তাদের মন দেবার প্রয়োজন হয় না, বা সুযোগও থাকে না। সত্যিকারের খেলা তাদের দিতে পারা যায় না বলেই তারা 'প্রেম প্রেম খেলার' নেশায় বুঁদ হয়, যেমন অভাবী লোক ভাতের অভাব তাড়ির নেশায় ভুলতে চায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে, ব্যক্তিগতভাবে, সংগঠনের তরফে এবং সরকারের দিক থেকে আর কালক্ষেপ না করে দেখা দরকার যাতে খেলাধূলার সুযোগ সুবিধা যথেষ্ট বাড়ানো যায়। অন্যথায় আমরা সমূহ সর্বনাশের মুখোমুখি দাঁড়াতে বাধ্য হব।

অপর্ণা লাহিড়ী, ধানবাদ, বিহার

কে প্রকৃত দায়ী

'প্রেম প্রেম খেলা বন্ধ হোক' পড়লাম। বর্তমান তরুণ-তরুণী তথা সমগ্র যুব সম্প্রদায়ের ঘুণধরা মনোবৃত্তির প্রতি বিশেষ প্রতিনিধির যে কষ্ট সাধিত রচনার অবতারণা—তার জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু এই প্রবন্ধকে দৃঢ়তর করবার জন্য তিনি কিছু অপ্রাসংগিক যুক্তি দিয়েছেন। তার প্রতিবাদ করছি।

প্রেম আগে যে রকম ছিল, এখনও সেই রকমই আছে। তুলনা করলে বলা যেতে পারে, বর্তমানে প্রেমের [illegible] বৃদ্ধি পেয়েছে। একথা বলা ঠিক নয় যে বর্তমান প্রেমে মাধুর্য নেই। বর্তমানে কপোত কপোতীর পরিবর্তে একটি নোংরা শব্দ 'জোড়া' ব্যবহার করার যুক্তি কোথায়?

তার নিবন্ধে আরেক জায়গায় জানলাম জনৈক সমাজতাত্ত্বিকের নানান যুক্তি। কিন্তু তার যুক্তি অনুসারেই জিজ্ঞাসা করছি—কেন বর্তমান যুব-সম্প্রদায় পুরনো মূল্যবোধ মানতে রাজি নয়? কেন তারা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দিশেহারা? কেন তারা পাশ্চাত্য উড়নচণ্ডী জীবনের দিকে ঝুঁকছে? কেন তারা নানা রকম নেশার প্রতি আসক্ত হচ্ছে এবং বিকৃত যৌন আচরণের মধ্যে সেই অসহায়তাকে ঢেকে রাখার চেষ্টা করছে? এর জন্য কি বর্তমান যুবসম্প্রদায়ই একমাত্র দায়ী? এর পেছনে কি সমাজের কোন ভূমিকা নেই? এদের এই ধরনের অধঃপতনের সঙ্গে সমাজের কি কোন যোগ নেই?

একটা ছেলে একটা মেয়েকে ভালবাসবে—এর মধ্যে নোংরামি কোথায়? ভালবাসা কি খারাপ? নাকি বর্তমানে ভালবাসার সংজ্ঞা পাল্টে গেছে? আগেকার দিনে প্রেম ছিল সকলের অজান্তে (রজ-বুলি)। কিন্তু আমরা মানি সকলের অজান্তে কোন কাজ করার অর্থই হল—অন্যায় কাজ। কিন্তু প্রেম করাকে, ভালবাসাকে আমরা অন্যায় কাজ নয় বলেই সকলের সামনে উপস্থিত করি। এতে লজ্জার কিছুই নেই। অথবা গুরুজন নামক ব্যক্তিদের অপমানিত করার অভিপ্রায়েও নয়।

আজ চল্লিশোত্তীর্ণ মানুষের মুখ থেকে শুনতে হয়—বর্তমান যুবসমাজ মেরুদণ্ডহীন প্রাণী। মানুষ নামের উপযুক্ত নয়। তবে শুধু এটাই কি মেনে নেব? যেতে পারে চল্লিশোত্তীর্ণ মানুষরাই একমাত্র মানুষ, মেরুদণ্ডযুক্ত। বাদবাকিরা মানুষ নয়, মেরুদণ্ডহীন প্রাণী। বরং বলা যেতে পারে এই চল্লিশোত্তীর্ণ মানুষদের জন্যই বর্তমানে যুব সম্প্রদায়ের এত অধঃপতন। তারা যুব সমাজের এই অধঃপতিত রূপ দেখে ঘৃণায় মুখ ঘোরান। কিন্তু তারা কি কোনদিন ভেবে দেখেছেন—এই যুবসমাজকে সৎপথে চালিত করবার পেছনে তাদের বিরাট কর্তব্য আছে। তারা কি সেই কর্তব্য পালন করেন? স্নেহের সুরে কাছে ডেকে কোনদিন কি তারা [illegible]? বলতে পারেন তারা বলবেন—যুবসমাজ তাদের ভালোবাসা বুঝতে চায় না। কথাটা হয়তো আক্ষরিক অর্থে সত্য। কিন্তু তাদের বোঝানোর অক্ষমতার জন্যই যুবসমাজ বুঝতে চায় না।

মানুষ সব সময় সঙ্গ চায়। কিন্তু বর্তমান যুবসম্প্রদায় সঙ্গ পাচ্ছে না—বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার জন্য। তখন প্রেম নামক সহজ হাতের কাছে পেয়ে ব্যবহার করছে। এজন্য বর্তমান যুবসম্প্রদায় অথবা প্রেমকে দোষারোপ করার কারণ নেই। বরং বলা যেতে পারে এর জন্য একমাত্র দায়ী বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা।

জনৈক পাঠক, আশুতোষ কলেজ, কলকাতা

চূড়ান্ত অধঃপতন

'প্রেম প্রেম খেলা বন্ধ হোক' রচনাটি পড়লাম। এরকম একটি সময়োপযোগী রচনার জন্য ধন্যবাদ।

আমি মফস্বল শহরের বাসিন্দা তবু কলকাতার এ রকম প্রেমের খণ্ড দৃশ্যের একজন সাক্ষী। প্রতিবেদকের সঙ্গে আমিও দেখেছি ভিক্টোরিয়া, সিনেমা হলে তথাকথিত প্রেম প্রেম কিংবা Free mixing-এর কামকেলি। 'কলকাতা যে ক্রমশ প্রেম নগরী' হয়ে যাচ্ছে দূর থেকেও সেটা বুঝতে পারি। অবশ্য সংস্কৃতির পীঠস্থান কলকাতার জন্য সমস্ত ভারতবাসীর মতো আমরাও চিরকালের জন্য গর্ববোধ করি। তবু এই মিছিল নগরী ক্রমশ অন্য রকম ভাবমূর্তি ধারণ করবে এরকম ভাবতে কষ্ট হয়। যদিও সম্ভাবনা শুধুই সম্ভাবনা। এখনি গুরুত্ব দিতে নারাজ।

তবুও প্রতিবেদক যাদের ইনটারভিউ নিয়েছেন, তাদের সাফাই শুনে আঁতকে উঠেছি। আমাদের ভবিষ্যৎ নেই। ভবিষ্যতের কথা ভেবে কি হবে। আমাদের জন্য কে ভাবে। এটা চানসের যুগ—এইরকম আর কি! এই কথাগুলি শুধু নৈরাশ্যবাদের কথা নয়, চূড়ান্ত অধঃপতনের কথা।

আমরা জানি পুরনো মূল্যবোধের কোন মানে নেই। তার মানে কি অশালীনতা? কোথায় এদের উক্তিতে পুরনো সমাজ ব্যবস্থা ভাঙার কথা? সুতরাং চিরাচরিত প্রথা ভাঙার নামে এ যেন একধরনের পলায়নী মনোবৃত্তি। তাই এরকম জবাবে নিজের প্রতিচ্ছবি কিংবা আমাদের যুবসমাজের ছবি মেলেনা।

সতীর্থদের বলছি: একটু ভেবে দেখুন, এই সমাজের বদলা আর কিছু নয়—বুর্জোয়া ব্যবস্থার চিরাচরিত [illegible] এবং এই ধরনের প্রেম প্রেম খেলায় মেতে ধ্বংসে [illegible] মানেই তাদের [illegible] পথ প্রস্তুত করা। আমাদের পথ ডিঙিয়ে যাওয়া নয়। রুখে দাঁড়ানো! তার জন্য সম্ভব নিষ্ঠাজাত প্রেমের সহায়তায় যথার্থ সঙ্গী নিয়ে। নিজের অধিকারকে জানান দিয়ে। কিন্তু সর্বজন সমক্ষে অশ্লীল খেলায় মেতে তাৎক্ষণিক ভোগের মধ্যে তলিয়ে যাওয়ার মধ্যে নয়। এর মধ্যে কোনো মহত্ব নেই।

আবীর চক্রবর্তী, কোচবিহার

পণ বন্ধ হবে

'প্রেম প্রেম খেলা বন্ধ হোক' গল্পটা পড়লাম। গল্পটার বেশিরভাগই বানানো কথায় ভর্তি করা হয়েছে। যদি উপযুক্ত বয়সের ছেলেমেয়েরা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসে তাতে 'আপত্তি' করবার মত কি থাকতে পারে? ভবিষ্যতে যদি এরা নিজেদের মধ্যে বিয়ে করে, তাহলে পরস্পর পরস্পরকে, অতীতে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশার জন্য 'চিনতে' পারে। ফলে হয়তো তারা সুখী হতেও পারে। তাছাড়া মেয়ের বাবার 'গলায়' গামছা দিয়ে টানাও (পণ) বন্ধ হবে।

অতীতে খুব কম বয়সে বিয়ে হতো, ফলে প্রেমের বালাই ছিলনা বললেই চলে। আজ সেই বয়সে বিয়ে না হওয়ার প্রধান কারণ 'বেকারত্ব'। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বেকার বা কলেজের ছেলেমেয়েরাই প্রেমের রাস্তা ধরে। যদি শিক্ষার শেষে বা বয়সকালে চাকরির ব্যবস্থা থাকতো তবে প্রেম করবার সময় পাওয়া যেত না। ফলে ঠিক সময়মত বিয়েও হতো।

তাই বলে বয়স কোন কারণে চুপ করে বসে থাকবে না। ফলে 'মনের বিয়ে' হবেই। আর যতদিন যাবে ততই প্রেম বাড়বে। সেইজন্য অন্যান্যদের 'উঁকিঝুঁকি' না মেরে নিজের সম্মান বজায় রাখাই ভালো। কোন বিরোধী স্লোগান দেওয়ার চেষ্টা করা ঠিক নয়।

দেবকী ঘোষ, মুকুটমণিপুর, বাঁকুড়া

পালটানো দরকার

'প্রেম প্রেম খেলা বন্ধ হোক' সময়োচিত এক উচ্চমানের রচনা। আজকের ক্ষয়িষ্ণু সমাজের ব্যাধিগ্রস্ত কতকগুলো যুবক-যুবতীর শারীরিক নৈকট্যের কাছে হার মানতে বাধ্য হয়েছে পারক, ময়দান বা গঙ্গা পারের মনোরম আবহাওয়া। তাই শিশুবর্ষেও অভিভাবকেরা তাদের শিশুদের সঙ্গে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কিংবা বোটানিক্যাল গার্ডেনের পরিচয় করাতে সাহস পাননি।

অপরদিকে সুধীনবাবুদের মেয়ের বিয়ের বাজেট এক লাখ ছাড়িয়ে দেড় লাখে পৌঁছচ্ছে। পাড়ার রমাদি, লক্ষ্মীদি কিংবা বাচ্চুদা-রা চল্লিশ ছুঁই ছুঁই করছে—তবুও বিয়ের কথা উঠছে না।

পণপ্রথা কিংবা প্রকাশ্য ফিজিক্যাল অ্যাটাচমেনট দুটিই নিন্দনীয় এবং ক্ষতিকর পন্থা। কিন্তু স্বাভাবিক কারণেই বিয়ে মানুষের জীবনে অত্যাবশ্যক। আমার মনে হয়, প্রতিটি যুবক-যুবতী এবং অভিভাবকের মনে 'প্রেম খেলা নয়, প্রেম একটি পবিত্র কর্তব্য' জাতীয় চিন্তার উন্মেষ ঘটানো প্রয়োজন। নানা সাংস্কৃতিক সংগঠনের মাধ্যমে পরিচয়ের গণ্ডীকে আরো ব্যাপক আকার দেওয়া দরকার। প্রয়োজন হলে 'পরিবর্তন'-জাতীয় প্রগতিশীল পত্র-পত্রিকায় বয়স্ক যুবক-যুবতীদের স্বল্প খরচে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জীবনসঙ্গী খুঁজে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া দরকার। আর সবচাইতে বেশি দরকার সমাজ সচেতন হওয়া। যে সমাজে দৈনিক দু' টাকায় ছাতাকলের অপ্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিক পাওয়া যায়, কিন্তু সেলুনে চুল-দাড়ি কাটা যায় না—সেই সমাজটাকে পালটে দেওয়ার চিন্তা করাটাই প্রতিটি যুবক-যুবতীর প্রাথমিক কর্তব্য হওয়া উচিত বলেই আমি মনে করি।

সঞ্জীবকুমার ভৌমিক, সমবায়পল্লী, হাওড়া

বিষাক্ত পরিবেশ

সত্যই আজকালকার ছেলেমেয়েরা প্রেম নিয়ে ছিনিমিনি খেলে সমস্ত পরিবেশকে বিষিয়ে তুলছে। যে কোন জায়গাতেই এদের জোড়ায় জোড়ায় ঘুরতে দেখা যায়। সিনেমা হলের ভিতরেও জোড়াদের নানা ভাবে পরস্পর পরস্পরকে আদর (?) করতে দেখা যায়। এ অবস্থায় কি আর মা-বোনদের নিয়ে সিনেমা দেখার উপায় আছে? আবার রাস্তা-মাঠ, পারক-ময়দানগুলোতেও একই অবস্থা। এসব দেখে মনে হয় সারা দুনিয়াটাই একদিন জোড়াদের জন্যই সংরক্ষিত হয়ে থাকবে।

জোড়ারা প্রেম জিনিসটা না বুঝেই প্রেমের মুখোশ পরে নেয়। তারা পরস্পরকে ভালবাসে শুধু দৈহিক কামনা চরিতার্থ করতে, তাও আবার নির্লজ্জের মত সবার চোখের সামনে। এমন চলতে থাকলে একদিন সেক্সের হুড়োহুড়িতে সমাজটা মহাবিষাক্ত হয়ে উঠবে। সেদিন আসার আগে এসব বন্ধ করার জন্য এখনই ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মাকুম জংসন, আসাম

[প্রেম প্রেম খেলা বন্ধ হোক—এ প্রসঙ্গে আমরা প্রায় দুশ চিঠি পেয়েছি। বিষয়টি যে অনেককেই ভাবিয়েছে চিঠির সংখ্যা-বিপুলতাই তার প্রমাণ। এ সংখ্যায় একগুচ্ছ নির্বাচিত চিঠি প্রকাশ করা হল। স্থানাভাবে এ প্রসঙ্গে আর কোন চিঠি প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

—সম্পাদক]

এবার কুড়ি টাকার সাম্মানিক পাবেন
মানসরঞ্জন সেনগুপ্ত

অনিবার্য কারণে সাম্মানিকের টাকা পাঠাতে অনেক সময় মাসাত্তিনেক লেগে যায়। অনুরোধ, অধৈর্য হবেন না।—সম্পাদক।



বাড়ির মালিক দুঃখ করেই বললেন, 'এমন ভাড়াটে মেলে না। ব্যাঙ্কের অফিসার। নতুন বিয়ে। মাসের প্রথম তারিখেই পুরো ভাড়া। নো ঝামেলা। তা আমার ছোটো ছেলে ঘরে বারবার উঁকি মেরে ওদের তুলে দিল হে।'

*

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ স্ট্রীট ক্যাম্পাস স্বল্প পরিসর। তাই মনের কথা বলতে কিছু ছাত্রছাত্রী বসেন সেনট্রাল লাইব্রেরিতে। বকবকমের বহর দেখে সেখানকার কর্মীরা মুখে কিছু না বলে রিডিং টেবিলে কাঠের ছোট্ট বোরড রেখে যাচ্ছেন। এতে লেখা : সাইলেনস প্লিজ।



অম্লমধুর

সূর্য গ্রহণের সময় কলকাতার রাস্তায় লোক ছিল না। কিন্তু পুলিশ ছিল। ওদের তো চোখ খারাপ হওয়ার ভয় নেই। কারণ ওরা এক চোখে অন্যের দিকে হাত বাড়ায়, আর এক চোখে কেউ দেখছে কিনা নজর রাখে। আকাশের দিকে ভুলেও তাকায় না।

কর্ণ সেন

সেদিন এক চোর ধরা পড়েছিল। আর ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে বেঁধেও ফেলা হয়েছিল। চারদিক দিয়ে ছেলে বুড়ো জমায়েত হচ্ছিল। তার মধ্যে কেউ কেউ বলল, 'আরে ওকে বেঁধে কি হবে? চাঁদা করে চালিয়ে যা।' আর একদল জানাল, 'আড়ং ধোলাই দিয়ে ইস্ত্রি চালারে।' এবার এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন, 'মামার বাড়ি পাঠিয়ে আপদ চুকিয়ে দে।'

চোরটি অধৈর্য হয়ে উঠল। বলল, 'যা করবার করে ফেলুন তাড়াতাড়ি। আরও পাঁচ বাড়ি যেতে হবে তো আমায়। এক বাড়ি নিয়ে পড়ে থাকলে তো আর আমার চলবে না।'

শান্তিকুমার দাস

এক ডাক্তার রুগীকে ভালো করে পরীক্ষা করার পর বললেন :

'ডাক্তার : আচ্ছা আমি যদি আপনার একটা কান কেটে দিই তাহলে কি হবে?

রুগী : কিছুই হবে না।

ডাক্তার : দুটো কানই যদি আপনার কাটি?

রুগী : তাহলে চোখে দেখতে পাবো না।

ডাক্তার : সে কি! দেখবেন তো চোখে, কান কাটলে দেখতে পাবেন না কেন?

রুগী : আজ্ঞে দুটো কানই যদি কেটে দেন তাহলে চশমার ডাঁটি দুটো কোথায় লাগাবো? আমি চশমা ছাড়া কিছুই দেখতে পাইনে।

শঙ্কর মুখারজি



দেশে দেশে

লেবাননে গৃহযুদ্ধের মেঘ ঘনাচ্ছে

বল্মীক

লেবাননের রাজনীতির আকাশে আবার গৃহযুদ্ধের মেঘ ঘনিয়ে উঠছে। সত্যিই যদি এই গৃহযুদ্ধ পূর্ণাঙ্গভাবে শুরু হয়ে যায় তবে তার পূর্ণ দায়িত্ব গিয়ে পড়বে দক্ষিণের হিংস্র প্যানথার ইসরায়েলের উপর।

সীমান্তবর্তী কুফার শোভা শহরের একটি স্কুলে একদিন ঢুকে পড়ল ইসরায়েলি বাহিনীর কজন লোক। একে ওকে মারধর করল। যাবার সময় বিনা কারণে স্কুলের হেড মাস্টার এবং অন্য দু'জন মাস্টার মশাইকে ধরে নিয়ে গেল। এর পরদিনই ইসরায়েলি বিমান হানা দিল দক্ষিণ লেবাননের আল রশিদিয়া এবং রাস আল-আয়েক অঞ্চলে। এখানেই আছে প্যালেস্টিনিয় মুক্তিযোদ্ধাদের শরণার্থী শিবির। এই দুটি ক্যামপের ওপরই তারা নির্বিচারে বোমা বর্ষণ করে গেল।

লেবাননের রাষ্ট্রপতি ডঃ সালিম আল-হোস জরুরি বৈঠকে বসলেন প্যালেসটিনিয় মুক্তি সংস্থার চেয়ারম্যান ইয়াসের আরাফতের সঙ্গে

অবরাফত ইরাকী দৈনিক আলথোয়ারার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বললেন, 'মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব সহায়তা নিয়ে ইসরায়েল দক্ষিণ লেবানন আক্রমণ করেছে। আমরা যেকোনো আক্রমণ মোকাবিলায় তৈরি আছি।' বস্তুত লেবাননী বাহিনীর সঙ্গে প্রতিরক্ষার কাজে হাত মেলালো প্যালেসটিনিয় মুক্তি সংস্থা।

লেবাননের দক্ষিণাংশে আর একটি বেসরকারি বাহিনী আছে। এর নাম দক্ষিণপন্থী মিলিশিয়া। এদের মুখপাত্র সাফাদ হাদদাদ ইসরায়েলি হানায় বাধা দেবার জন্যে বেনট জুবেল শহরের ১৫০টি পরিবারকে খতম করে দেবার হুমকি দিয়েছেন।

লেবাননের রাষ্ট্রপতি ইলিয়াস সরকিস প্যালেসটিনিয় মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানিত অতিথি বলে স্বীকার করেছেন। তার মানে অধিকৃত প্যালেসটিনকে মুক্ত কৈরার জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামীরা লেবাননকে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করেন এবং মধ্যপ্রাচ্যের সমস্ত রাষ্ট্রেরই তাতে সায় আছে।

ইসরায়েল চায় লিতানি নদী পর্যন্ত তার পরিধি বাড়াতে এই ক্ষুধার্ত আগ্রাসনের জন্যেই ইসরায়েলিরা কুফার তিবনিত এবং আরনান গ্রামদুটি ধ্বংস করে দিয়েছে, উড়িয়ে দিয়েছে আল রশিদিয়া এবং আল-বাস ক্যামপ দুটি।

অথচ গতবারের গৃহযুদ্ধের ছাই ধুলোয় মেশবার আগেই এখানে এসে হাজির হয়েছেন রাষ্ট্রসংঘের পর্যবেক্ষক। তার চোখের ওপরেই এই আক্রমণ ঘটেছে কিন্তু তিনি বিশেষ কোন প্রভাব ফেলতে পারেননি।

ইসরায়েলিরা প্যালেসটিনিয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সন্ত্রাসবাদী বলে উল্লেখ করে। নিজেরা দক্ষিণ লেবাননের যতগুলি গ্রাম আক্রমণ করে এবং ধ্বংস করে তার সবগুলিকেই তারা সন্ত্রাসবাদীদের কাজ বলে চালিয়ে দেয়। এতে সুবিধে অনেক বেশি। কিন্তু বিদেশী সাংবাদিকরা ব্যাপারটি মেনে নিতে পারেননি। ইসরায়েল নিজেদের একটি বিমান হানার পর এই ধরনের বেশ কিছু সাংবাদিককে গ্রামগুলিতে ঘুরিয়ে আনে। সাংবাদিকরা নিজের চোখে ধ্বংসলীলা দেখে মন্তব্য করেছেন—এমন পরিকল্পিত ধ্বংস কখনও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সমর্থন ছাড়া সম্ভব নয়।

এখন কথা উঠতে পারে, ইসরায়েল হঠাৎ দক্ষিণ লেবাননের উপর চড়াও হল কেন. আর সে প্রসঙ্গে গৃহযুদ্ধের কথাই বা উঠছে কেন?

লিতানি নদী পর্যন্ত বিস্তৃত লিতানি উপত্যকা অত্যন্ত উর্বর এবং সমৃদ্ধ অঞ্চল। এই অংশ দখল করতে পারলে সে তার শস্যভাণ্ডার গড়ে তুলতে পারবে। তাছাড়া এই অঞ্চলেরই সংযোগস্থলে রয়েছে সিরিয়া, লেবানন ও ইসরায়েলের মিলনভূমি। পশ্চিমে রয়েছে ভূমধ্যসাগরের আরও বৃহত্তর সুযোগ যা ইওরোপে যাবার পক্ষে অত্যন্ত সুবিধাজনক যুদ্ধনীতির দিক থেকে এবং বাণিজ্য বিস্তারে তাই এ জায়গার দাম অনেক বেশি

১৯৭৮ সালে ইসরায়েল 'অপারেশন লিতানি' নাম দিয়ে একটি যুদ্ধ-অভিযান চালিয়েছিল এবং প্রায় দক্ষিণাংশ দখল করে নিয়েছিল। তাদের এই পররাজ্যলোভ বিশ্ববাসী ভালো চোখে নেয়নি। ফলে নানা জায়গায় প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। বেগিনের মারকুটে বাহিনী তখন ঐ দখল করা জমি ছেড়ে হটে আসে। কিন্তু রেখে আসে সাফাদ হাদদাদের দক্ষিণপন্থী বাহিনীকে। তারা অতঃপর ইসরায়েলের স্বার্থ বুঝে জাতীয় স্বাধীনতার বারোটা বাজায় এবং জাতীয়তাবাদী বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। গৃহযুদ্ধের সূচনা এর থেকেই। কিন্তু গৃহযুদ্ধে দক্ষিণপন্থী মিলিশিয়া কোন সুবিধে করতে পারেনি ফলে কেন্দ্রে যে সরকার বসে তারা যথারীতি নিজের পথে চলতে শুরু করে এবং আরব সেনটিমেনটকে মূল্য দিয়ে প্যালেসটিনিয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আশ্রয় দেয়।

হাদদাদের দক্ষিণপন্থী মিলিশিয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘ জরুরী বাহিনীর ওপরেও হামলা শুরু করে যাতে তারা হটে যায় এবং তখনই নানা অপকর্ম তারা বিশ্বজনমতের আড়ালে বসে করতে পারে।

দক্ষিণপন্থীরা চাইছে পুরো দক্ষিণ লেবানন থেকে অধিবাসীরা সরে যাক। যাতে ইসরায়েলি বাহিনী এখানে নির্বিঘ্নে ঢুকতে পারে এবং দক্ষিণপন্থী মিলিশিয়ার মুখোসের আড়ালে কাজ চালাতে পারে।

এখানকার সাধারণ মানুষ ব্যাপারটিকে সহজ মনে মেনে নেননি। কারণ এই অঞ্চলেই ক্যামপ করে বসে আছেন প্যালেসটিনিয় স্বাধীনতা সংগ্রামীরা। তার সঙ্গে রয়েছে জাতীয় বাহিনী।

ফলে মাঝে মাঝেই ঠক্কর লাগছে দু'পক্ষে। কথা হচ্ছে. দক্ষিণপন্থী মিলিশিয়া অস্ত্র পাচ্ছে কোথা থেকে? প্রথমে মনে হতে পারে, নিশ্চয়ই ইসরায়েলই তাদের অস্ত্র যোগাচ্ছে। বিশেষত ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোশে দায়ান প্রকাশ্যেই বলেছেন, দক্ষিণ লেবানন দখল করে আমরা বিশ্ববাসীকে বুঝিয়ে দেব পৃথিবীতে কারোর চেয়ে ছোট নেই।

অথচ প্রকৃতপক্ষে এদের অস্ত্র যোগাচ্ছে মারকিন যুক্তরাষ্ট্র। এ অস্ত্র অবশ্যই ইসরায়েলের হাত–ফেরতা হয়ে আসছে। অস্ত্র দক্ষিণপন্থী মিলিশিয়া ঠিক মত কাজে লাগাচ্ছে কিনা তা জানার জন্য মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বতন অ্যাটরনি জেনারেল র‍্যামসে ক্লারক দক্ষিণ লেবাননে গিয়েছিলেন। সেখানে গ্রামগুলি দেখার পর ইসরায়েলিদের আচরণে তিনি শিউরে ওঠেন এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামে মারকিন ভয়াবহ অত্যাচারের সঙ্গে এর তুলনা করেন।

ক্যামপ ডেভিডে চুক্তি হয়েছিল ইসরায়েল ওয়েসট ব্যাংক এবং গাজাকে অধিকার মুক্ত করে স্বশাসন দেবে। সে স্বশাসন ইসরায়েল দেয়নি। এখন লেবাননে একটা দীর্ঘস্থায়ী গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দিয়ে প্রথমত ঐ স্বশাসন প্রতিশ্রুতি পিছিয়ে দেওয়া যাবে এবং দ্বিতীয়ত আরব রাষ্ট্রগুলিকেও ভয় দেখানো যাবে।

অন্যতম আরব রাষ্ট্র মিশর ক্যামপ ডেভিডে চুক্তি করে অন্যান্য আরবদের বিরাগভাজন হয়েছে। লেবাননের দক্ষিণপন্থী মিলিশিয়া হবে সেই মঞ্চ যেখান থেকে অনেক ফয়দা লোটা যায়। কারণ মিশরকে সে অঞ্চলের মানুষ আর বিশ্বাস করে না। আর সেই জন্যেই ইসরায়েল দক্ষিণপন্থী মিলিশিয়ার মধ্যে তার নতুন অবলম্বন খুঁজে পেয়েছে। ★

পথ চলতি

ফল-নিষ্ফল

আজকাল প্রায় প্রতি স্টেশনেই ফল বিক্রির ফলাও কারবার। নিত্যযাত্রীর অভিজ্ঞতা অবশ্য বড়ো নিষ্ফলা। ট্রেন আসে। হাজার যাত্রীকে উগরে দেয় প্ল্যাটফরমের ওপর। যাত্রীরা বস্তা-ছেঁড়া আলুর মত ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ইদানীং তারা আর ছড়িয়ে পড়তে পারছে না। বাধা পায় ফলের ডালায়।

সেদিন ট্রেন থেকে নামছি। সঙ্গে আরো সহযাত্রী-যাত্রিণী। ট্রেন এসে প্ল্যাটফরমে লাগতেই নামা-ওঠার তুমুল ধাক্কাধাক্কি। বেঁচে থাকা যার রূপক। টালমাটাল পথ



খুঁজছি। সতর্ক ফলওয়ালার ডালার পাশ দিয়ে বেরিয়ে যেতে সফল হতেই ফলওয়ালা ছুবলে উঠলেন, 'কী মশাই! এটা হাঁটবার পথ নাকি?'

সত্যিই তো! প্ল্যাটফরম তো অবতরণিকা। মোটেই হাঁটবার পথ নয়। তবে এদের যারা মাথায় তুলেছেন তারা যদি আমাদেরও মাথায় তুলতেন, তবে আমরাও আর প্ল্যাটফরমে হাঁটতাম না। লজ্জিত অপরাধীর মত ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেলাম। মাথায় চড়তে যে শিখিনি!

নিজন দেচৌধুরী

ছোট্ট অভিজ্ঞতা

লেক গার্ডেনসে আমার এক রসিক বন্ধু থাকেন। রোজ ট্রেনে করে শেয়ালদা আসেন এবং হ্যারিসন রোডে ব্যবসা করেন। একদিন তার দোকানে সান্ধ্য আড্ডায় আলোচনা হচ্ছিল পশ্চিমবঙ্গে বাস করে সবচেয়ে কষ্টকর আর অসহ্য অভিজ্ঞতা কার কার কি হয়েছে।

প্রথম বন্ধু: এয়ার কনডিশনড ঘরে লোডশেডিং।

দ্বিতীয় বন্ধু: দার্জিলিং মেল তিনঘণ্টা লেট করে শেয়ালদা পৌঁছালো তারপর সপরিবারে লটবহর নিয়ে প্ল্যাটফরমের বাইরে এসে শুনি কলকাতায় ট্যাক্সি ধর্মঘট হয়েছে।

তৃতীয় বন্ধু: একবার দুন এক্সপ্রেস ধরবার জন্যে ট্যাক্সি করে যাচ্ছি। পুরো হাওড়া ব্রিজে ট্রাফিক জ্যাম। অনেক কষ্টে রিজারভেশন করা টিকিট ব্যবহার করতে পারলাম না।

রসিক ব্যবসায়ী বন্ধু বলল, তোমরা সবাই বড় বড় অভিজ্ঞতার কথা বললে। আমি একটা ছোট অভিজ্ঞতা বলছি। একদিন ট্রেনে চেপে লেক গার্ডেনস থেকে আসছি। পার্ক সার্কাস স্টেশনের পর যেখানে গরুর চামড়া ট্যানিং হয় সেখানে এ-ক ঘ-ন-টা যান্ত্রিক গোলযোগে বিকল হয়ে ট্রেন দাঁড়িয়ে ছিল।

নিবারণ চক্রবর্তী

মেঘ ও রৌদ্র

হাওড়া স্টেশনে ব্ল্যাক ডায়মনড এক্সপ্রেসে ঘোমটা টানা এক বিবাহিতা বিহারী যুবতীর ডুকরে ডুকরে কি কান্না। নিঃসন্দেহে কোন শোকাবহ ঘটনার শরিক যুবতীটি। চমৎকার চেহারা। ঢলঢলে পদ্মপাতা মুখ, আয়ত হরিণী চোখ, কপালে বিশাল টিপ। গায়ের সিনথেটিক শাড়িটির বর্ণবাহারও অদ্ভুত। সান্ত্বনা দিচ্ছেন বয়স্ক এক ভদ্রলোক। পাশাপাশি সিটের সকলেই বিমূঢ়। ট্রেন ছাড়তে বয়স্ক ভদ্রলোক নেমে গেলেন। পাশে বসল এক যুবক। লিলুয়া পেরুতে না পেরুতেই যুবতীর মুখে মেঘভাঙা রোদ্দুর মত হাসি ঝলসে উঠল। নিঃসঙ্কোচে সে মেহেদী রঞ্জিত হাতখানার নিটোল আঙুলে আঁকড়ে ধরল যুবকের হাত। উজ্জ্বল দাঁতের সারিতে খুশির বিচ্ছুরণ। এত দ্রুত পট পরিবর্তন। হিন্দিতে সংলাপের মধ্যে কিছু অংশের উদ্ধৃতি দিই।

—কি ব্যাপার! এত হাসি। কেঁদে তো ভাসিয়ে দিচ্ছিলে।

—আহা বাপের বাড়ি থেকে যাচ্ছি। না কাঁদলে বাবা কি ভাবতেন বলত।

অশোককুমার সেনগুপ্ত

অন্য লাইন

যাচ্ছিলাম কল্যাণীর দিকে। এক সময় ট্রেন এসে থামল সোদপুর স্টেশনে। প্ল্যাটফরমের দিকে নজর পড়তে দেখি জনাপাঁচিশেক সুবেশা ভদ্রমহিলা এক ল্যাম্পপোস্টের কাছাকাছি কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। অবাক হলাম খুবই। প্রাত্যহিক জীবনের কিউ-এর ঢেউ যে প্লাটফরমেও এসে পৌছুবে তা ভাবিনি। মনে হল—ওরা হয়ত লেডিজ কামরায় ওঠার জন্যই কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে হঠাৎ চোখ পড়ল আকাশের দিকে। সেখানে তখন শ্বেততপ্ত সূর্য আগুন ছড়াচ্ছে। আর ঠিক তখনই নিচের দিকে তাকাতেই সমাধান হল আমার জটিল ধাঁধার। খুবই কৌতুক বোধ করলাম। বুঝতে পারলাম ভদ্রমহিলারা ল্যাম্প পোস্টের লম্বমান ছায়াকে আশ্রয় করে সরীসৃপের মতন অগ্রসর হয়েছেন। ট্রেন ধরবার তাগিদে নয়, নিছকই সূর্যের খরতাপ হতে মাথা বাঁচাবার তাগিদে। আশির দশকের প্রথম গ্রীষ্মটা তাহলে এসেই পড়ল।

প্রশান্তকুমার আঢ্য

উলট পুরাণ

'...একদল যুবক চেতলার পিয়ারীমোহন রায় রোডে এক সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীকে আক্রমণ করে। তারা ওই পুলিশ বাহিনীকে তাড়া করে। পুলিশ কর্মীরা ছুটে গিয়ে ৯ নম্বর পিয়ারীমোহন রায় রোডে ২৪ পরগণা জেলার এনফোরসমেন্ট পুলিশের ওই অফিসে ঢুকে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেন। তখন ওই বাড়ির উপর ইঁট-পাটকেল ও বোমা বর্ষণ শুরু হয়। ওই পুলিশ



অফিসের দরজা জানলা ভেঙে একদল যুবক ভেতরে ঢুকে পড়ে। এবং ওই অফিসের কাগজপত্র ও আসবাবে আগুন ধরিয়ে দেয়।...

ওই অফিসের এনফোরসমেনট পুলিশের সব কর্মী দাবি তুলেছেন, কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা না হলে তাদের পক্ষে কাজ করা মুশকিল।'

ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতার এক বহুল প্রচারিত দৈনিকের প্রথম পাতায় প্রকাশিত খবর।

বিশ্বজিৎ সিংহ

ব্যঙ্গচিত্র : সাহিত্যী

ক্ষুধার হাত থেকে মুক্তি কবে ? কি ভাবে ?

মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর আর শাডোল জেলার সীমা থেকে কুদরা গ্রাম খুব একটা দূরে নয়। কয়েক সপ্তাহ আগের কথা। খরার কবলে পড়েছে এই অঞ্চল। চারদিকে শুধু ধূ ধূ রুক্ষতা। গাছপালার পাতাও যেন সব জ্বলে গেছে। সবুজের চিহ্ন মেলা ভার। একজন সাংবাদিক ঘুরতে ঘুরতে সেই গ্রামে এসে পৌঁছান এক দুপুরে। রাজধানীতে

সুদীপ মজুমদার

বসে সরকার যে সব কথা প্রচার করে তা মিথ্যা প্রমাণ করে সারি সারি চলমান কঙ্কাল তাকে ঘিরে ধরে। মানুষগুলোর হাড্ডিসার চেহারা শুধু চামড়া দিয়ে ঢাকা। [illegible] কুদরা গ্রামের অনেকেরই ভাত বা রুটি জোটেনি।

সেখানে খিদের জ্বালা মেটাতে মানুষ ঘাস খেতে শুরু করেছে। ১৬ বছরের মেয়ে [illegible] তার সমস্ত শরীর ফুলে ফেঁপে উঠেছিল সে মারা গেছে ২৯ ফেবরুয়ারি। ও গ্রামের আরও অনেকের শরীর নানান রোগে ফুলে উঠছে। সারাদিনে খাবার বলতে জোটে কয়েক মুঠো 'চরুহলা' (এক ধরনের ঘাস) সেদ্ধ। কাজ নেই; খাবার নেই। শুধু অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর প্রতীক্ষা।

সরকারী চোখে এসব ঘটনা মিথ্যা। কতদিন যে হয়ে গেছে কুদরার মানুষ কোনও সরকারী কর্মচারীকে ওদিকে পা মাড়াতেও দেখেনি। কুদরার মত গ্রাম আর সেখানকার মানুষের মত অবস্থা সারা দেশের অনেক গ্রামেই পাওয়া যাবে। এ চিত্র শুধু ভারতবর্ষেই নয়। এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার বহু দেশেই খাদ্যের অভাব এখন চূড়ান্ত।

এই পরিপ্রেক্ষিতে গত মাসের ইউনাইটেড নেশনস-এর Food and Agriculture Organisation (FAO)-এর আঞ্চলিক সম্মেলন উল্লেখযোগ্য। যখন কুদরার গ্রামে খিদের জ্বালায় মানুষ ছটফট করছিল, তখন এয়ারকনডিশনড গাড়িতে চেপে বড় বড় পাঁচ-তারা মার্কা হোটেল থেকে সব দেশী-বিদেশী ডেলিগেটরা দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে 'ক্ষুধার সমস্যা' আলোচনা করতে রওয়ানা হচ্ছিলেন। সপ্তাহ-খানেক ধরে ওদের আলোচনা চলে

আজ থেকে ছ'বছর আগে বিশ্ব খাদ্য সম্মেলন হয়। তাতে ধনী, গরীব সব দেশই যোগ দেয়। সম্মেলন শেষ হবার পর এই আশা ব্যক্ত করা হয় যে আগামী ১০ বছরের মধ্যে সারা পৃথিবী থেকে ক্ষুধাকে নির্বাসন দেওয়া হবে। সেই আশা শুধু আকাশকুসুমই থেকে গেছে। বাস্তবে ক্ষুধার জ্বালায় জর্জরিত হয়েছে এবং হচ্ছে আরও বেশি মানুষ। যুদ্ধ, ধ্বংস আর অপচয় এই জ্বালাকে ক্রমে বাড়িয়েই চলেছে। সম্ভবত তাই ফাও (FAO) সম্মেলন অনেক পরিশ্রম করেও ক্ষুধার সমস্যা মেটানোর কোনও তাৎক্ষণিক সমাধান দিতে পারল না।

খাদ্য সামগ্রী উৎপাদনের ভবিষ্যৎ চিত্র খুবই ভয়াবহ। আগামী কয়েক বছরে এই অবস্থার উন্নতির কোনও আশা দেখা যাচ্ছে না। শুধু ভারত নয়, রাশিয়ার মত দেশও খরার কবলে পড়েছে। অন্যদিকে ব্রাজিলে শস্য উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বেশি বৃষ্টিপাতের জন্য আমেরিকার কৃষি দপ্তরের হিসাব অনুযায়ী, এ বছর [illegible] সারা পৃথিবীর শস্য উৎপাদন হবে ১৫২ কোটি টন। গত বছর এই উৎপাদন ছিল ১৫৮ কোটি টন। এ বছর গম ও চালের উৎপাদনও কমে গেছে।

গত বছর (অর্থাৎ ১৯৭৮-৭৯ সালে) ভারতবর্ষে মোট শস্য উৎপাদন হয় রেকর্ড ১৩ কোটি টন। গম ও ধান দুই ফসলই ভালো হয়। কিন্তু চলতি বছরে মোট শস্য উৎপাদন কমে যাবে বলেই বিশেষজ্ঞদের আশংকা।

ওয়ারল্ড ফুড কাউনসিল ও ইনটার-ন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনসটিটিউট কিছু সমীক্ষা করেছে। এই সমীক্ষা থেকেও ভবিষ্যতে খাদ্য উৎপাদন পরিস্থিতিতে উন্নতি হবার কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে না। আশঙ্কা করা হয়েছে—বিশ্বের বাজারে শস্যের দামও ক্রমেই বেড়ে যাবে। এর ফলে যে সব উন্নয়নশীল দেশ খাদ্য আমদানি করে তাদের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যাবে।

আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি কত রকম সমীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে বছরের পর বছর। এতে কি কারও (বিশেষত অনুন্নত দেশগুলোর) কোনও সুরাহা হয়েছে? বাস্তব জবাব—না, কোনও রকম অবস্থার উন্নতি হয়নি; বরং অনুন্নত দেশগুলোর খাদ্য সমস্যা আরও তীব্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এর প্রমাণ পাওয়া যাবে একটা সাধারণ তথ্যে। সত্তরের দশকে উন্নয়নশীল দেশ-গুলির খাদ্য আমদানির মোট পরিমাণ ছিল ৫ কোটি টন। কিন্তু এ বছর এই দেশগুলিকে প্রায় ৭.৫ কোটি টন খাদ্যসামগ্রী আমদানি করতে হবে। এছাড়া এই দেশগুলির খাদ্যের চাহিদা ও আভ্যন্তরীণ সরবরাহের মধ্যে প্রায় ৯ কোটি টনের ফারাক থেকে যাবে।

এবার আমাদের দেশের অবস্থাটা একটু দেখা যাক। ১৯৭৭ সাল থেকে ভারত শস্য আমদানি স্থগিত রেখেছে। ভাল শস্য উৎপাদন হবার ফলে সরকার বলেছে—আর আমদানির দরকার নেই। প্রায় দেড় কোটি টন খাদ্য শস্য মজুত করা আছে দেশে। জনতা সরকার খাদ্য উৎপাদন ও শস্য মজুতের 'ভাল অবস্থা' থাকার দরুন 'ফুড ফর ওয়ার্ক' যোজনা চালু করেন ১৯৭৭-এর এপ্রিল-মে মাসে।

এই প্রোগ্রামের মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামাঞ্চলে বেকারত্ব দূর করার জন্য মজুদ খাদ্য শস্যের ভাণ্ডার থেকে মজুরি হিসাবে শস্য দেওয়া। গ্রামে রাস্তা বানানো, সেচের ব্যবস্থা করা, মাটি কাটা ইত্যাদি কাজ হাতে নেওয়া হয়। এ সব কাজের জন্য শ্রমিকদের খাদ্য শস্য মজুরী হিসাবে দেওয়া শুরু হয়। আশা করা হয়েছে—এর ফলে ক্ষুধার সমস্যা কিছুটা সমাধান করা যাবে, আর গ্রামাঞ্চলে শস্যের দাম যাতে বাড়তে না পারে তারও কিছুটা ব্যবস্থা হবে

'ফুড ফর ওয়ার্ক' প্রকল্প ১০টি রাজ্যের ২০টি জেলায় ৪০টি ব্লক ও ৮০টি গ্রামে চালু করা হয়। মোট ৭৯০টি পরিবার এর আওতায় পড়ে। পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহারও এই যোজনার অন্তর্ভুক্ত।

কয়েকদিন আগে প্ল্যানিং কমিশনের একটি কমিটি এই যোজনার সমীক্ষা রিপোরট প্রকাশ করেছে। ৫৪ পাতার এই রিপোরটে দেখা গেছে ২০টি জেলার মধ্যে ১৩টি জেলাতেই এই প্রকল্পের কোনও রকম লাভজনক ফল পাওয়া যায়নি। মাত্র ছটি জেলায় গমের দাম সামান্য পরিমাণে কমেছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে—যে ৭৯০টি পরিবারের মধ্যে খুব কম পরিবারই মাসের সবকটা দিন কাজ পেয়েছে।

প্ল্যানিং কমিশনের সমীক্ষা চমৎকার ভাবে দেখিয়ে দিয়েছে যে কিভাবে ভ্রষ্টাচার ও সরকারী ঔদাসীন্য 'ফুড ফর ওয়ার্ক' প্রকল্পকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। উন্নতিমূলক যে সব কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল তা গ্রামাঞ্চলের প্রয়োজনীয়তার দিকে নজর রেখে নির্বাচন করা হয়নি। যেখানে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলোর সাহায্য নেওয়া হয় সেখানে অপেক্ষাকৃত ভাল কাজ হয়েছে। বিভিন্ন সরকারী এজেন্সির মধ্যে বোঝাপড়া না থাকার দরুন প্রকল্প ঠিকমত পরিচালিত হয়নি।

এমনও দেখা গেছে যে লোকাল কনট্রাকটর আর পঞ্চায়েতের প্রধানরা গরীবদের জন্য দেওয়া শস্য নিজেদের পকেটস্থ করেছে। যে টাকা গরীব মানুষের কাজে লাগার কথা তা দিয়ে স্কুলের বাড়ি, ডাক্তারখানা ইত্যাদি করা হয়েছে। অনেক কনট্রাকটর খোলা বাজারে প্রকল্পের শস্য বিক্রি করে দিয়েছে। কয়েকটি জেলায় ঠিকমত শস্য পৌঁছায়নি।

এই প্রসঙ্গে কুদরা গ্রামে আবার ফিরে যাওয়া যাক। ওই গ্রামের লোকদের অভিযোগ: তাদের কাজ করিয়ে মজুরী দেওয়া হয়নি। ওদের বক্তব্য: ৫ কিলো-মিটার লম্বা একটা কাঁচা সড়ক তারা সেপটেমবর মাসেই তৈরি করে ফেলেন। কিন্তু আজ অবধি তার জন্য কোনও রকম মজুরী তাদের দেওয়া হয়নি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে—বাড়তি শস্য মজুত থাকা সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ গরীব মানুষ তার দ্বারা উপকৃত হতে পারেননি। কিন্তু এই বাড়তি বা উপচে পড়া সরকারী ভাঁড়ারের কথাটা কতটা সত্য তা দেখা যাক। খাদ্য অর্থনীতির অবস্থা সমীক্ষা করার জন্য খাদ্য সামগ্রীর দামের বাড়া কমা পরীক্ষা করা যেতে পারে। ১৯৭৪-৭৫ সাল থেকে ১৯৭৮-৭৯ সাল পর্যন্ত জিনিসপত্রের দাম ২ শতকরা হারে বেড়েছে; কিন্তু খাদ্য শস্যের বেলায় বেড়েছে ৫.৫ শতকরা হারে। গত কয়েক বছর ধরে খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে। একথা সরকারই স্বীকার করেছেন। কিন্তু একদিকে যেমন উৎপাদন বেড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে অন্য দিকে চাল, গম, অন্যান্য শস্য, চিনি সব কিছুরই দাম বেড়ে চলেছে। তাহলে সরকারী ভাঁড়ারে ১.৭ কোটি টন খাদ্যশস্য থেকে গরীব মানুষের কী লাভ হচ্ছে? আসলে তো দেখা যাচ্ছে সরকার মজুত করা সত্ত্বেও খাদ্যশস্যের দাম কমেনি, বরং বেড়েই চলেছে। দুবেলা দুমুঠো ভাত বা কয়েকটা রুটি খাবার মত অবস্থাও ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ মানুষের নেই। সরকার হয়ত চান দুর্ভিক্ষে চাল, গম বিতরণ করতে; কিন্তু যখন দুর্ভিক্ষের মত অবস্থা, যখন মানুষ ঘাস পাতা খেয়ে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে, তখন সরকারী গুদামে হাত পড়বে না। তা সেখানে ইঁদুরের উৎপাত বাড়ুক অথবা ভাল স্টোরেজ ব্যবস্থা না থাকার দরুন শস্য পচে নষ্ট হোক। তাই ১.৭ কোটি টন খাদ্য শস্য মজুত থাকলেই যে উল্লসিত হতে হবে এমন কোনও কারণ নেই।

দেশে যখন লোকে অনাহারে, অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে তখন ভারত সরকার খাদ্য রপ্তানীর কথা ভাবছেন। কী বিচিত্র পরিহাস। শুধু তাই নয়। সাধারণ মানুষ, বিশেষত গ্রামাঞ্চলের গরীব মানুষের অবর্ণনীয় সমস্যা সম্বন্ধে দিল্লির সরকার জেনেশুনেই অজ্ঞতার ভান করেন। তা নইলে খাদ্য উৎপাদন আর মজুতের কৃতিত্ব জাহির করার জন্য মোটা মোটা সরকারী হ্যানডবুক বিলি করা হত না।

এই পরিপ্রেক্ষিতে World Bank, FAO বা অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার ভূমিকাও অনেকটা হাস্যকর মনে হয়। আসলে ধনী দেশগুলো দ্বারা প্রভাবিত এই সব সংস্থা গরীব দেশগুলোকে নানান রকম মিঠে বুলি দিয়ে গরীবই রাখতে চায়। যদি এইসব সংস্থা সত্য সত্যই ক্ষুধাকে পৃথিবী থেকে নির্বাসিত করতে চাইত তবে সম্মেলন ইত্যাদির পর কিছু বাস্তব ক্রিয়াকাণ্ডও দেখা যেত। 'ফাও'কেই ধরা যাক। এই সংস্থার বোরডে ধনী দেশগুলিরই প্রাধান্য। কোনও রকমের দুর্যোগ এলে তার মোকাবিলা করার জন্য 'ফাও'র দরকার ২৫ লাখ টন খাদ্যশস্য। কিন্তু আজ তার কাছে আছে মাত্র ৮০,০০০ টন। এই সামান্য মজুত দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলার এক মাসও চলবে না। সারা পৃথিবীর কথা তো দূরে যাক।

মারকিন সরকার দ্বারা প্রভাবিত সংস্থাগুলি শস্য উৎপাদন বাড়ানোর জন্য নানারকম প্রযুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত সুপারিশ করে থাকে। মূলধন বাড়াও, উৎপাদন বাড়বে—এও তাদের মন্ত্র। তার মানে ওদেশ থেকে চড়া দামে সুদ দিয়ে টাকা ধার নিয়ে নিজেদের শস্য উৎপাদনের কাজে লাগাও। এটা তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিকে শোষণ করার আর এক কায়দা। এরা কখনও ভূমি সংস্কারের কথা বলে না। বলে না নিজেদের দেশে লক্ষ লক্ষ টন খাদ্য সামগ্রীর অপচয়ের কথা। বিশ্বের বাজারে শস্যের দাম যাতে পড়ে না যায় তাই আমেরিকা লাখ লাখ টন খাদ্যশস্য সমুদ্রে ফেলে দেয় অথবা পুড়িয়ে নষ্ট করে দেয়। যে দেশ এই কাজ করতে পারে সেই দেশ যখন 'ক্ষুধা নির্বাসন' করার শ্লোগান তোলে তখন সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক।

'ফাও'র ডাইরেকটর শ্রীমতী গান্ধীকে বলেছেন—তার সংগঠন সাহায্য চান যাতে কৃষির কাজে লাগার মত যন্ত্রপাতিকে বিশ্বের মুদ্রাস্ফীতির আওতার বাইরে রাখা যায়। কিন্তু কৃষিতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির দাম যাতে না বাড়ে—তার চেষ্টাই কি কোটি কোটি মানুষকে অনাহার অর্ধাহারের মুখ থেকে বাঁচানোর জন্য সব থেকে দরকারী পদক্ষেপ?

বিশ্বব্যাঙ্ক বা 'ফাও' ধরনের সংস্থাগুলি ক্ষুধার সমস্যা সমাধান করার পেছনে কি রাজনীতি চালায় তা অতি নিপুণ ভাবে দেখিয়েছেন সুসান জর্জ নামে এক মহিলা তার বই 'How the other half dies—the real reasons for world hunger'-এ। তিনি বলেছেন—যতদিন না তৃতীয় দুনিয়ায় ভূমি সংস্কার হচ্ছে এবং গরীব ও শোষিত শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে নানান ডিভাইস সঠিক ভাবে বিতরণ হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত শস্য উৎপাদন বাড়লেও ক্ষুধা থেকেই যাবে। উৎপাদন শুধু ধনী দেশগুলির হাতে অথবা গরীব দেশের ধনী শাসকের আয়ত্তেই থেকে যাবে। সুসান জর্জ বলেছেন—তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলো পাশ্চাত্যের ধনী দেশগুলোর উপর নির্ভরতা না কমালে সমস্যার সুরাহা সম্ভব নয়। ধনী দেশগুলো গরীব দেশের ধনীদের সঙ্গে জোট পাকিয়ে পৃথিবীতে ক্ষুধাকে বাঁচিয়ে রাখতেই চায়।

সুসান জর্জ ৩৪৮ পাতার বইটির ভূমিকা লিখতে গিয়ে বলেছেন "If it takes you six hours to read this book, somewhere in the world 2,500 people will have died of starvation or of hunger-related illness by the time you finish."

কী নিদারুণ, কী ভয়ঙ্কর সত্য! কুদরা গ্রামের মানুষগুলোর শুকনো মুখ কি দিল্লির দরবারে কারও মনে পড়বে? ★

বৃহস্পতিই ভরসা

জীবন ভৌমিক

জ্যোতিষীদের তথাকথিত ভবিষ্যৎবাণী নয়। বিশ্বের বিখ্যাত সব জ্যোতির্বিদ এবং বৈজ্ঞানিকগণ জানিয়ে দিয়েছেন যে আর মাত্র বাইশটি মাস বাকি। ১৯৮২ সালের ফেবরুয়ারি মাসের যে কোনও দিন সৌরজগতে ভয়ংকর এক ঘটনা ঘটবে। এবং এর ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ ভূকম্পনে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মহাপ্রলয়ও ঘটে যেতে পারে।

সম্প্রতি যে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হয়ে গেল সে সম্পর্কে জ্যোতিষীরা নানারকম ভবিষ্যদ্বাণী করলেও বৈজ্ঞানিকগণ স্বভাবতই কোনও অযুক্তিনির্ভর ভবিষ্যদ্বাণী করেননি। বরং পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকরা মানুষকে অকারণে আতঙ্কিত হতে বারণ করেছিলেন। কিন্তু আগামী ১৯৮২ সালে সৌরজগতে সমস্ত গ্রহের যে অবস্থান ঘটবে তার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরাই বেশ আতঙ্কিত।

ঐ সময় সৌরমণ্ডলের সবকটি গ্রহ একই সঙ্গে সূর্যের মুখোমুখি এক সারিতে এসে দাঁড়াবে। ফলে সূর্যের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সঙ্গে সমস্ত গ্রহের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানাটানি চলবে। এই ঘটনার প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া হবে সূর্য দেহের ভিতরে এবং বাইরে। সূর্যের চৌম্বকশক্তি তার আভ্যন্তরীণ কার্যকলাপকে বহুগুণ বাড়িয়ে তুলবে। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে বলেছেন যে এইসব প্রতিক্রিয়ার ফলে বায়ুমণ্ডলে দেখা দেবে হঠাৎ গতি পরিবর্তন। পৃথিবীর সর্বত্র আবহাওয়ার চরিত্র বদল হয়ে যাবে।

সবচেয়ে ভয়ের কথা হল—সূর্যের মুখোমুখি পৃথিবী সমেত অন্যান্য সমস্ত গ্রহের অবস্থানের ফলে গ্রহগুলির ঘূর্ণন গতির হার হঠাৎ বাধাপ্রাপ্ত হবে। গাড়িতে ব্রেক কষলে চলন্ত অবস্থায় যেমন ঝাঁকুনি লাগে, ঘূর্ণমান গ্রহগুলিতেও অল্পবিস্তর তেমন ঝাঁকুনি পড়বে। লনডন প্ল্যানেটেরিয়মের ডিরেকটর জন এরিডন বলেছেন—এই ঝাঁকুনির মাত্রার উপর আমাদের পৃথিবী নামক এই গ্রহটির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। এই ঝাঁকুনির ফলেই পৃথিবী কেঁপে উঠবে, ভূমিকম্প হবে। ঝাঁকুনির মাত্রা বেশি হলেই সর্বনাশ।

সূর্যের সঙ্গে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানাটানিতে সূর্যকে বেশি উত্তেজিত করে তুলবে বৃহস্পতি গ্রহ। সমগ্র সৌরমণ্ডলে বৃহস্পতি হল সবচেয়ে বৃহৎ গ্রহ। তার আয়তন প্রায় এক হাজারটি পৃথিবীর সমান। এই বৃহস্পতি যখন অন্যান্য গ্রহের সঙ্গে এক সারিতে দাঁড়িয়ে সূর্যের একক প্রচণ্ড শক্তিকে নাড়া দেবে তখন যে কোনও অঘটন ঘটে যেতে পারে।

বিজ্ঞানীরা এখন বৃহস্পতি গ্রহের হালচাল পর্যবেক্ষণ করছেন। আমরা চাই বৃহস্পতির মাথা ঠাণ্ডা থাকুক। বৃহস্পতিই এখন একমাত্র সহায়। ★

বালক ব্রহ্মচারী কি চৈতন্যের অবতার?

জলপাই রঙের জিপ WBJ 8853 ছুটছে ব্যারাকপুর ট্রাংক রোড ধরে। সোদপুর···ডানলপ ব্রিজ···। দু পাশে মিশ-মিশে লোড শেডিং। জিপের পতাকাদণ্ডে উড়ছে তিনকোণা গৈরিক পতাকা, তাতে সাদা ত্রিশূল আঁকা। সামনে ছুটছে কালো এ্যামবাসাডর। পতাকা তাতেও। জিপের সামনের সিটে সামরিক ধরনের উর্দি পরা কয়েকজন তরুণ। মাথায় টুপি। টুপিতে ও শার্টের হাতার ব্যাজে লেখা S. D.। অর্থাৎ সন্তান দল। জিপের পিছন দিককার সিটে ঠাসাঠাসি করে কয়েকজন সাদা-পোশাকের কর্মীর সঙ্গে এই প্রতিবেদক।



সামনের এ্যামবাসাডরে রয়েছেন সন্তান দলের সর্বাধিনায়ক 'ঠাকুর' বালক ব্রহ্মচারী। দুটি গাড়িই ছুটছে ২৪ পরগণার একটি প্রান্তিক আধাগ্রাম আধাশহরের দিকে। সেখানে সন্তান দলের সভা।

সন্তান দল। গরম গরম দেওয়াল লিখন, ট্রেনের কামরায় ছাপা বা হাতে লেখা পোসটার আর এখানে সেখানে 'রাম নারায়ণ রাম' ভজনার কারণে এ দলের নাম অনেকেরই জানা।

এ দল সম্পর্কে অনেকে কৌতূহলী, অনেকের বাঁকাচোখ, আবার কেউ কেউ বলছেন, ও কিছু না, একটা হুজুগ। দল-নায়ক 'ঠাকুর' বালক ব্রহ্মচারী সম্পর্কেও ঐ একই রকম মিশ্র ধারণা।

গাড়িতে যেতে যেতে সন্তান দলের এক বিশিষ্ট কর্মীর মুখে শুনছিলাম 'ঠাকুর মাহাত্ম্য'। কর্মীটি বলছিলেন তার নিজের অভিজ্ঞতার কথা: সেটা উনিশ শো ছিয়াত্তর। তাকে বিশেষ কাজে আন্দামানে যাবার আদেশ দিলেন 'ঠাকুর'। কর্মীটি সেই মতো ব্যবস্থা নিলেন, সমস্ত ঠিকঠাক, টিকিট কাটা হয়ে গেছে, এমন কি ইনজেকশন নেওয়াও।

কিন্তু না, যাওয়া তার হলো না। যেদিন জাহাজে চড়বেন, ঠিক সেদিনই সকাল বেলায় 'ঠাকুর' তাকে ডেকে বললেন, তোর আর যাবার দরকার নেই। কর্মীটি অবাক। একটু মন খারাপও। কেন ঠাকুর যেতে বারণ করলেন—সে প্রশ্নের জবাব কিন্তু পেলেন দু তিন দিন পরে, যখন সংবাদপত্রে পড়লেন আন্দামানগামী জাহাজে ঘটেছে দুর্ঘটনা, হতাহত হয়েছেন কয়েকজন।

ভক্তের বিশ্বাস। কর্মীর নির্ভরতা দল-নায়কের প্রতি। এ বিশ্বাসেই দুঃখ-জর্জর, দারিদ্র্যক্লিষ্ট গাঁ-গেরামের মানুষ ভিড় করেন

বিশেষ প্রতিনিধি

মছলন্দপুরের 'বালক ব্রহ্মচারীর মিটিমে', সমাজ স্রোতে দিশেহারা শয়ে শয়ে লোক ভেঙে পড়ে চব্বিশ পরগণার সুখচরের গঙ্গাতীরে 'বালক ব্রহ্মচারী ধামে'। পোলিওগ্রস্ত শিশুকে 'ঠাকুরের' পায়ে ছোঁওয়ান শীর্ণা কোনো মা, ফুসফুস শুকিয়ে আসা পিতাকে নিয়ে 'ঠাকুর' দর্শনের লাইনে দাঁড়ান বিষণ্ণ যুবক।

পাশাপাশি আরও এক বিশ্বাস; সে বিশ্বাস সমাজ পরিবর্তনের। নীরক্ত বেকার তরুণ আর বিধ্বস্ত গৃহস্থের হাতে তুলি বুরুশ, আলকাতরার টিন। শিলিগুড়ি থেকে ক্যানিংয়ের দেওয়ালে দেওয়ালে গোটা গোটা হরফ: 'ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে সন্তান দল মুখোশধারীদের আক্রমণ করতে।' সমাজ পরিবর্তন —কিন্তু সন্তান দলের বক্তব্য তা রাজনীতি নয়। 'ষড়যন্ত্রকারীরা সাবধান এরকম দেওয়াল লিখনের পাশাপাশি সন্তান দলের কর্মীরা এও জানাতে কসুর করেন না: 'সন্তান দল মরবার জন্য প্রস্তুত, সন্তানদল রাজনীতি করে না।

কি সে 'ষড়যন্ত্র' এবং তা কারা করছে, সেকথা কিন্তু দেওয়াল লিখন জানায় না।

সন্তান দল কি ধর্মীয় সংস্থা? 'ঠাকুর' বালক ব্রহ্মচারী মিটিঙে খোলামেলাভাবে বলেন: আমি ধর্মপ্রচার করতে আসি নাই, আমি এসেছি মানুষকে জাগাতে।

অর্থাৎ ধর্ম নয়, রাজনীতিও নয়, কিন্তু স্বপ্ন—সমাজ বদল।

কয়েকজন সন্তান দল কর্মীর সঙ্গে কথা বলে জেনেছি, তাদের বিশ্বাস: সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে, যিনি সারা পৃথিবীর সংকট মোচন করবেন শীঘ্রই, বেদের আদর্শে, হিংসার পথে।

সন্তান দলের বাতাস কাঁপানো আরও একটি দাবি: শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই এ যুগে বালক ব্রহ্মচারী রূপে আর্বিভূত হয়েছেন। 'প্রেমাবতার শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তার মাতুল বিষ্ণুদাস ঠাকুরের কাছে এক ভবিষ্যৎবাণী করে বলেছিলেন যে, বিষ্ণুদাসের বংশের ত্রয়োদশ উত্তর পুরুষে ভাগিনেয় রূপে তিনি আবার আর্বিভূত হবেন। ঐ বংশের ত্রয়োদশ উত্তর পুরুষে ভাগিনেয় হলেন শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজ।' (কে এই যুগাবতার?/হুগলী জেলা সন্তান দল)

সন্তান দল এই দাবির সঙ্গে কিন্তু কোন

‘গান্ধীবাদ কাপুরুষের নীতি, টেরেসা সমাজের ক্ষতি করছেন’

দেওয়াল লিখন আর জনসভার মাধ্যমে সন্তান দল অনেকেরই কৌতূহল জাগিয়েছে। যেন হঠাৎই। এ’দল সম্পর্কে অনেকেরই রয়েছে আগ্রহ, আবার অনেকে বলছেন ঃ এঁদল চলে বিদেশি টাকায়। এ দলের কেন্দ্রপুরুষ শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী—অনেকের কাছে ‘অবতার’। কি চায় সন্তান দল ? রাষ্ট্র-ক্ষমতা ? না কি শুধু ধর্ম-প্রচার ? সামাজিক পরিবর্তন ? কি ভাবে, কোন পথে ? নানান প্রশ্ন নিয়ে আমাদের প্রতিনিধি সাক্ষাৎ করেছিলেন শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারীর সঙ্গে ঃ

পরিবর্তন ঃ সন্তান দল কি ধর্মীয় সংঘ না কি রাজনৈতিক সংস্থা ? অথবা ধর্ম-রাজনীতির প্রতিষ্ঠান ?

শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী ঃ না, ধর্মীয় সংস্থা বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলতে এখন যা বোঝায় সন্তান দল তার একটিও নয়। রাজনীতির নামে, ধর্মের নামে দেশে যা চলছে তা নির্মূল করার জন্যই সন্তান দল। ‘দল’ অর্থে পার্টি নয়—সন্তান দল হলো সমবেত সন্তানগণ।

পরিবর্তন ঃ সন্তান দল কবে গঠিত হয় ? কি কি কর্মসূচী ?

বালক ব্রহ্মচারী ঃ সন্তান দল গঠিত হয়েছে তা প্রায় বছর তিরিশ হবে। শোষণ-হীন সমাজ গড়াই আমাদের উদ্দেশ্য। বেদ-ভিত্তিক সাম্যবাদই পারে মুক্ত সমাজ গড়তে। এ জন্য সমাজের পরগাছা অসুরদের বিনাশ করে মুনাফা লোটা বন্ধ করতে হবে।

পরিবর্তন ঃ বেদভিত্তিক সাম্যবাদ আর মার্কসীয় সাম্যবাদের মধ্যে তফাৎ কোথায় ?



বালক ব্রহ্মচারী ঃ আমি মার্কসবাদ সম্পর্কে তেমন কিছুই জানিনা। হাজার হাজার বছর আগের বেদে রয়েছে শোষণমুক্ত সমাজের কথা, সাম্যবাদের কথা। মার্কস নতুন কিছু নন, বেদ পড়েই তিনি সাম্যবাদের কথা চিন্তা করতে পেরেছিলেন।

পরিবর্তন ঃ বেদভিত্তিক সাম্যবাদ কিভাবে প্রতিষ্ঠা করবেন ?

বালক ব্রহ্মচারী ঃ সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে অস্ত্রের মাধ্যমে, হিংসার পথে। আমাদের এই পথের সন্ধান দিচ্ছে বেদ। এ পথেই আসবে প্রকৃত ধর্ম, প্রকৃত রাজনীতি।

আজ তথাকথিত ধর্মের নামে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে ! কালী,দুর্গা, কৃষ্ণ, রাম—সব দেবতাই অসুর বিনাশ করেছেন ; অথচ ধর্মের নামে লতাপাতা ফুলফল দিয়ে তাঁদের পূজা করতে শেখানো হচ্ছে, তাঁদের মতো অস্ত্র ধরতে শেখানো হচ্ছে না।

রাজনীতির নামে যা চলছে তা ব্যবসা ছাড়া কিছু নয়। দলের নাম করে কিছু বলবো না। সবারই রয়েছে ক্ষমতার লোভ। কারো গায়ে অহিংসার নামাবলী, কারো টিকি বিদেশি সুতোয় বাঁধা।

দেশের সবচেয়ে ক্ষতি করেছে গান্ধী।

প্রামাণ্য তথ্য দেননি। প্রেমাবতার নিমাই মহাপ্রভু এমন কথা তার মাতুল বিষ্ণুদাসকে বলেছিলেন কিনা, এবং বালক ব্রহ্মচারীই যে সেই উত্তর পুরুষ—একথার সমর্থনে কোন প্রামাণ্য নজির বা বংশ লতিকা বালক ব্রহ্মচারী বা সন্তান দল কোথাও উপস্থাপন করেননি।

নদের নিমাই বাংলা জয় করেছিলেন প্রেমের মন্ত্রে, ‘হরে কৃষ্ণ হরে রাম’ ধ্বনিতে। বালক ব্রহ্মচারী এবং সন্তান দল কিন্তু ‘হরে কৃষ্ণ হরে রাম’ ভজনা করেন না, তারা ‘পৃথিবীকে শান্তির স্বর্গে’ পরিণত করতে গান—‘রাম নারায়ণ রাম।’

‘রাম নারায়ণ রাম’ এ ধ্বনির পিছনে সন্তান দল একটি তত্ত্বও দিয়েছেন। ‘ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজ এই পৃথিবীর আমূল পরিবর্তনের জন্য হত্যা-হানাহানি-শোষণ-বঞ্চনার বৃত্তি ঘুচিয়ে মানুষের অন্ত-র্নিহিত সত্য সুন্দরের প্রকাশের জন্য এক অভিনব হাতিয়ার দিয়েছেন তার কর্ম-সৈনিক, কর্মযোদ্ধা সন্তান দলের সন্তানদের হাতে। সে হাতিয়ার বেদ নাম, বেদমন্ত্র—রাম নারায়ণ রাম। যে প্রণব ধ্বনি ওঙ্কার ধ্বনি থেকে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি, যে ওঙ্কার ধ্বনি বিশ্বের সৃষ্ট সকল বিষয়বস্তুর মধ্যে বিবৃত, শিশুর ক্রন্দনে, আর্তের আকুতিতে, ব্যথা যন্ত্রনার প্রকাশে যার প্রমাণ আমরা অহরহ পেয়ে থাকি ওঁয়া, ওঁ, উঁ ইত্যাদি শব্দের মাধ্যমে। সেই ‘ওঁ’ ধ্বনিকে ‘রাম (ওঁ) নারা (ওঁ) ণ (ওঁ) রাম (ওঁ)’ নামের মধ্যে মিশিয়ে দিয়েছেন। দলবদ্ধ উচ্চঃস্বরে এই নাম কীর্তণের মাধ্যমে পৃথিবীর আবহ-মণ্ডলে যে সামগ্রিক প্রতিঘাত সৃষ্টি হবে, তার ফলে মানুষের অন্তর্নিহিত সেই সুপ্ত সত্ত্বা, সত্য সুন্দরের সত্ত্বা জাগ্রত হবে, তার মধ্যে দেবত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে—পৃথিবী শান্তির স্বর্গে পরিণত হবে।’ (রাম নারায়ণ রাম/হুগলী জেলা সন্তান দল)

শ্রীশ্রীচৈতন্যও চেয়েছিলেন শান্তির স্বর্গ গড়তে। সারা বাংলাদেশকে ভাসিয়ে ছিলেন প্রেমের সাগরে—‘হরে কৃষ্ণ হরে রাম’ এর ভাবমাধুর্যে। সে ধ্বনিতে থমকে গিয়েছিল নবাব হুসেন শাহর সেপাইরা, দুর্দান্ত জগাই-মাধাইয়ের চোখে এনেছিল জল। সন্তান দল এ ধ্বনিকে বাতিল করে দিয়েছেন। প্রশ্ন একটাই ঃ পাঁচশো বছর ধরে চলে আসা ‘হরে কৃষ্ণ হরে রাম’ ধ্বনির মৃদু মাধুর্য আজ ক্ষীয়মাণ, রেকরড এ্যামপ্লিফায়ারের ‘রাম নারায়ণ রাম’ ধ্বনি কি সে মাধুর্য একেবারে মুছে দেবে ?

এল ২০ বাসে সুখচর গির্জা স্টপেজ। সঙ্গী ছিলেন সন্তান দলের এক বয়স্ক কর্মী। রিকসা চালককে কিছু বলতে হলো না, দেখলাম তারও গলায় ঝুলছে রুপোলী চেন, যা দেখেছি অনেক সন্তান কর্মীর গলায়, লকেটের একপিঠে সুস্মিত বালক ব্রহ্মচারী, অন্য পিঠে ‘রাম নারায়ণ রাম’। রাস্তায় মোড়ের খুপরি চায়ের দোকানেও দেখলাম বালক ব্রহ্মচারীর ফটো ! রিকসা ছুটলো অলিগলি পিচের সড়ক ধরে। দেখলাম চলেছেন আরো অনেকে, অনেকেই পায়দলে, কেউ কেউ রিকসায়। দুপাশের দেওয়ালে দেওয়ালে সন্তান দলের নানান লিখন। দেওয়াল দখলের লড়াইয়ে এখানে এ দলের কাছে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি অনেক

গান্ধীবাদ হলো কাপুরুষের পলিসি, নপুংসকের নীতি।

পরিবর্তন: সন্তান দলের সদস্য সংখ্যা কতো?

বালক ব্রহ্মচারী: সন্তান সবাই। —অর্থাৎ দেশ মাতৃকার সন্তান। তবে সদস্য বলতে যা বোঝায় তাতে সন্তান দলের সদস্য সংখ্যা আড়াই কোটির কিছু বেশি। দিনে দিনে সন্তান আরও বাড়ছে।

পরিবর্তন: শুধু দেওয়াল লিখন আর জনসভা না কি সক্রিয় রাজনীতিতেও নামবেন? সংসদীয় গণতন্ত্রের পথে, না কি···

বালক ব্রহ্মচারী: আমাদের দেশে গণতন্ত্র নাই, সংসদীয় গণতন্ত্রের কথা তাই এ ক্ষেত্রে ওঠে না। আর রাজনীতিও আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বিবেকের জাগরণের মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করা সন্তান দলের কাজ। রাজনীতি ও ধর্মনীতির নামে দিকে দিকে যে ব্যক্তিপূজা চলছে তা দূর করে সবার সমান অধিকারের সমাজ গঠন সন্তান দলের লক্ষ্য।

পরিবর্তন: আপনার প্রতি আপনার ভক্তদের যে শ্রদ্ধা—তাও কি ব্যক্তিপূজা নয়?

বালক ব্রহ্মচারী: হ্যাঁ, তাও ব্যক্তিপূজা। যে যেভাবে আমার কাছে আসে তাকে আমি সেভাবেই টেনে নিই। আসলে আমি কর্মী গড়ি। ব্যক্তি থেকে ব্যাপ্তির পথে নিয়ে যাই। এ ভাবেই আমি সকলকে খাল বিল নদী নালা থেকে মহাসাগরে নিয়ে যাবো।

পরিবর্তন: সন্তান দলের কোন কর্মী কি কোন রাজনৈতিক দলেরও সদস্য হতে পারেন?

বালক ব্রহ্মচারী: হ্যাঁ পারেন। সন্তান দলের সঙ্গে কংগ্রেস, সি পি এম, জনতা সমস্ত পারটিরই বহু নেতা ও কর্মী যুক্ত আছে। তবে রাজনীতি করাটা তাদের ক্ষেত্রে হলো বাইরের কাজ। আর সন্তান দল হলো তাদের ঘর। সুতরাং ঘরের কাজে আমি যেদিন তাদের ডাকবো, বাইরের কাজ ফেলে তারা সেদিন ঝাঁপিয়ে পড়বে।

পরিবর্তন: আপনাদের দেওয়াল লিখনের সঙ্গে নকশালপন্থীদের দেওয়াল লিখনের কিছু ভঙ্গীগত মিল আছে···

বালক ব্রহ্মচারী: নকশালদের সঙ্গে আমাদের কোন মিল নাই। তাদের কাছে দলই বড়ো, আমাদের কাছে তা নয়। আমরা কোন দল নই—একথা আগেই বলেছি। নকশালপন্থীরা অনেকেই আমার কাছে আসে, ওদের নেতা জঙ্গল সাঁওতাল প্রায়ই আসে।

পরিবর্তন: কেউ কেউ বলে আপনার সংগঠনের পিছনে রয়েছে বিদেশি টাকা···

বালক ব্রহ্মচারী: যারা বলে তারা না জেনে বলে। আমাদের আদর্শ হলো একান্নভুক্ত পরিবারের মন নিয়ে চলা। প্রত্যেকের শ্রমদানে এই বিরাট সংসারটি চলছে। কোন আর্থিক অনুদান এখানে নেওয়া হয়না। এই সংগঠনে আছে ডাক্তার, ইনজিনিয়ার, উকিল কেরানী, শিক্ষক অধ্যাপক আছে মোটর মেকানিক, শ্রমিক, চাষী, ঘরামি, প্রেসকর্মী —নানান জীবিকার 'সন্তান'। অনেকেই এখানে ছোট থেকে বড়ো হয়েছে। এরাই চালাচ্ছে এই 'পরিবারটি'।

পরিবর্তন: জনসেবামূলক কোন কাজ সন্তান দল করে কি?

বালক ব্রহ্মচারী: না, শোষিত মানুষকে কর্মী বানানোই সন্তান দলের কাজ। সর্বহারা মানুষকে কম্বল আর চিঁড়েমুড়ি দেওয়ার একটাই অর্থ: তাকে আরও ভিখারী বানানো।

পরিবর্তন: তাহলে, মাদার টেরেসা···

বালক ব্রহ্মচারী: টেরেসা সমাজের ক্ষতি করছেন। তিনি পাঁচশো বা হাজার ভিখারী অসহায়ের পেটের আগুন নেভাতে পারেন, তাতে সেই খেতে পাওয়া ভিখারীরা তাদের কোটি কোটি শোষিত ভাইয়ের কথা ভুলে যায়। কিন্তু পাঁচশো শোষিতকে কর্মী করে তুললে কোটি মানুষ জেগে উঠতে পারে। টেরেসা তো বিদেশি টাকা পান, কই সে কথা তো কেউ বলে না।

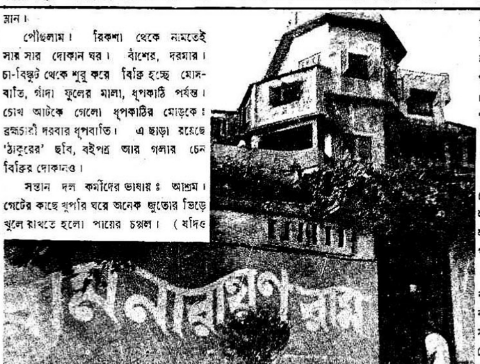
পরিবর্তন: নেতাজী প্রসঙ্গে কিছু বলুন, তিনি কি বেঁচে আছেন? অনীতা কি তাঁর কন্যা?

বালক ব্রহ্মচারী: এ ব্যাপারে আমি এখন কিছু বলবো না।

স্নান।

পৌঁছলাম। রিকশা থেকে নামতেই সার সার দোকান ঘর। বাঁশের, দরমার। চা-বিস্কুট থেকে শুরু করে বিক্রি হচ্ছে মোমবাতি, গাঁদা ফুলের মালা, ধূপকাঠি পর্যন্ত। চোখ আটকে গেলো ধূপকাঠির মোড়কে: ব্রহ্মচারী দরবার ধূপবাতি। এ ছাড়া রয়েছে 'ঠাকুরের' ছবি, বইপত্র আর গলার চেন বিক্রির দোকানও।

সন্তান দল কর্মীদের ভাষায়: আশ্রম। গেটের কাছে খুপরি ঘরে অনেক জুতোর ভিড়ে খুলে রাখতে হলো পায়ের চপ্পল। (যদিও



পরে দেখেছি, আশ্রমের ভিতরে ব্রহ্মচারী স্বয়ং চপ্পল পরেন। বাটা কোমপানির হালফ্যাশান।) আশ্রম, কিন্তু না, আশ্রমের গাম্ভীর্য, সুনিবিড় ছায়া, শান্ত আবহাওয়া নেই। সান বাঁধানো লনে গাড়ির ভিড়। গঙ্গার দিকে পাঁচিলে বসে আছেন তিনটি তরুণ, দুটি তরুণী—আলাপ করে জানলাম তারা শিষ্য—অর্থাৎ 'সন্তান'।

প্রাসাদোপম তিনতলা বাড়ি। চিলে কোঠায় টি ভির অ্যানটেনায় রোদ চমকাচ্ছে। লনের পাশে দরজা বন্ধ শিব মন্দির—গাঢ় লাল রং করা। মন্দিরের গায়ে লেখা: টাকা পয়সা প্রণামী দেবেন না।

সিঁড়ির নিচে টেবিলে বিক্রির জন্য হরেক বই, কাগজ পত্র, ফটোগ্রাফ। এক বৃদ্ধ কর্মী বসে আছেন, আমি ঢুকতেই আমাকে দিলেন সন্তান দলের একটি প্রচার পত্র। দেখলাম সেখানেই বিক্রি হচ্ছে 'জাগৃহী' পত্রিকা আর সন্তান দলের মুখপত্র 'কড়া চাবুক'। জাগৃহীর টাইটেলের দুপাশে নেতাজী আর মা কালীর ছবি। (প্রসঙ্গত: বেশ কয়েক বছর আগে

জাগৃহী পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের ভিত্তিতে ছাব্বিশে জানুয়ারির ভোরবেলা হাজার হাজার মানুষ ভিড় করেছিলেন কল্যাণীতে—প্রিয়-নেতাকে বরণ করার জন্যে। তারপর জন-সভার চেয়ার পুড়েছিল, মণ্ডপ পুড়েছিল। উদ্যোক্তারাও ছিলেন-গরহাজির।)

সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা রাখতেই হেঁ-হেঁ করে পথ আটকালেন এক যুবক। ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন ঃ উপরে যাইবেন কই? উত্তর দিলেন আমার সঙ্গী ভদ্রলোক : আমার লোক। বাধা পাইনি আর কোথাও। নিচে যত্রতত্র বসে আছেন অনেকে। সিঁড়িতে সিঁড়িতে ভিড় মহিলাদের—সে ভিড়ে নাতির হাতধরা বৃদ্ধাও আছেন, আছেন স্কুলছাত্রী কিশোরীও। অপেক্ষা করছেন বালক ব্রহ্মচারী দর্শনের জন্য।

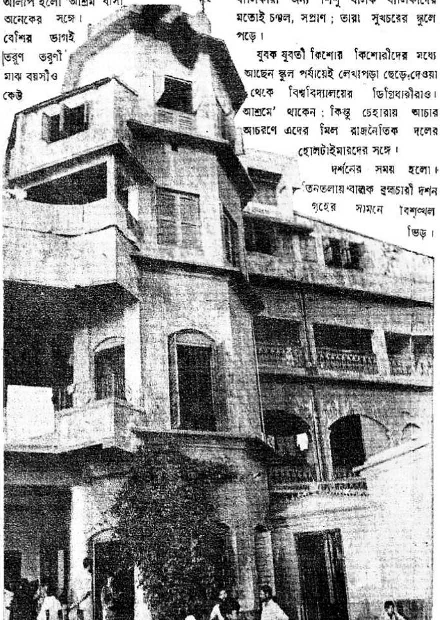
উপরে উঠে সঙ্গী ভদ্রলোকের মাধ্যমে আলাপ হলো 'আশ্রম' বাসী অনেকের সঙ্গে। বেশির ভাগই তরুণ তরুণী মাঝ বয়সীও কেউ কেউ। অনেক গল্পগুজব করলেন। এক তরুণ বললেন : ভাল দিনে এসেছেন, আজ 'অমুক' আসবেন। কৌতূহল হলো। 'অমুক' এ রাজ্যের একজন ভি আই পি, রাজনীতি এবং বাণিজ্য দু ক্ষেত্রেই তিনি নামী দামী। না, নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাবার অনেক পরেও তিনি আসেননি।

দোতলায় বিশেষ অতিথিদের বিশ্রাম ঘরে কথা বলছিলেন কয়েকজন ভদ্রলোক। সেদিনই একটি রাজনৈতিক দলের নির্বাচন-প্রার্থীদের নাম ঘোষণা হবার কথা। থাড়া কানে জানলাম, এদের একজনের খুব সম্ভাবনা মনোনয়ন পাবার। আলোচনা চলছে সে বিষয়েই।

এই বিরাট 'আশ্রমে' থাকেন শ-দেড়েক সন্তান। আবালবৃদ্ধবনিতা। শিশু বালক বালিকারা অন্য শিশু বালক বালিকাদের মতোই চঞ্চল, সপ্রাণ; তারা সুখচরের স্কুলে পড়ে।

যুবক যুবতী কিশোর কিশোরীদের মধ্যে আছেন স্কুল পর্যায়েই লেখাপড়া ছেড়ে-দেওয়া থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারীরাও। আশ্রমে' থাকেন : কিন্তু চেহারায় আচার আচরণে এদের মিল রাজনৈতিক দলের হোলটাইমারদের সঙ্গে।

দর্শনের সময় হলো। তিনতলায় 'বালক ব্রহ্মচারী দর্শন গৃহের সামনে বিশৃঙ্খল ভিড়।



তদারকি করছেন চার তরুণ আর তিনজন মধ্যবয়সী। সকলেরই বাসনা ব্রহ্মচারীর চরণ স্পর্শ। ভক্তি এবং বিশ্বাসে সে ভিড়ে নারী পুরুষ সকলেই সমান।

আমার সঙ্গী সন্তান, দল কর্মীটির সৌজন্যে দাঁড়াতে পেরেছিলাম সুবিধাজনক জায়গায়, যেতে পেরেছিলাম ব্রহ্মচারীর কাছাকাছি। দেখলাম শুধু প্রণাম, দর্শনই নয়, দীক্ষাও নিচ্ছেন অনেকে। হাসনাবাদ থেকে আসা একটি আট বছরের ছেলে আর বাংলাদেশ থেকে আসা এক বৃদ্ধাকেও দীক্ষা নিতে দেখলাম। পদ্ধতিটি এই রকম ঃ যিনি দীক্ষা নেবেন তিনি ব্রহ্মচারীকে বললেন : দীক্ষা নেবো। ব্রহ্মচারীর পাশে দাঁড়ানো এক কর্মী সঙ্গে সঙ্গে একটি টিনের বাকস থেকে ভাঁজ করা কাগজ ব্রহ্মচারীর হাতে দিলেন, সে কাগজটি ব্রহ্মচারী তুলে দিলেন ভক্তটির হাতে। চিরকুটটিতে লেখা 'ওঁ ক্লীং' বা গোবিন্দায় নমঃ' কিংবা ঐ জাতীয় কোন মন্ত্র।

যদিও নিচের শিবমন্দির দেখেছি প্রণামী টাকা পয়সা নেবার রীতি নেই, উপরে কিন্তু দেখলাম 'ঠাকুরের' পায়ে পড়েছে সিকি আধুলি, পাঁচ দশ টাকার নোটও। এক 'আশ্রমবাসী' সযত্নে সেগুলি সংগ্রহ করে বাকসে রাখছেন।

ভিড় কাটতে কথা বলার সুযোগও মিলল বালক ব্রহ্মচারী মহারাজের সঙ্গে। নানান কথা। প্রসঙ্গ দেব দেবী, তাদের অস্ত্র, ভারতবর্ষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। বেদ ভিত্তিক সাম্যবাদ। জানালেন, নেতাজীকে তিনিই বলেছিলেন, সুভাষ এবার ঝাঁপিয়ে পড়ো, ইংরেজদের কচুকাটা করে বিদায় করো। বললেন, নেহরু, রাধাকৃষ্ণন, বিধানচন্দ্র থেকে অজয় মুখার্জি পর্যন্ত সবাই তার আশীর্বাদ-ধন্য—এদের অনেককেই তিনি বলে দিয়েছেন, এটা ঠিক, ওটা ভুল। বিজ্ঞানী সত্যেন বসুও তার আশিসে বলীয়ান, বিশ্ববিশ্রুত। বললেন, দিন আসছে, আসছে ঝড়—অনেক কিছুই তোমরা দেখতে পাবে।

মাথায় হাত ছোঁওয়ালেন, হাত তুলে নমস্কার করলাম।

খুব খিদে পেয়েছিল। দূর মফস্বল থেকে কলকাতা আসি যাই। ভোরের ট্রেন ধরার দরুন চা-বিসকুটের বেশি কিছু পেটে পড়েনি। সঙ্গী ভদ্রলোক তা আন্দাজ করে বসিয়ে দিলেন খাবার ঘরে। বিশিষ্ট অতিথিদের সঙ্গে এই অধমকেও।

শিউলি ফুলের মতো ধপধপে গরম ভাত। নারকেল ভাসা সোনামুগের ডাল। ইলিশের চার রকম রান্না। শীত শেষের ফুলকপি··· শুনলাম প্রতিদিন শ' দেড়েক আশ্রমিক সেই সঙ্গে কমপক্ষে আরো একশো অতিথির পাত পড়ে। পরিবেশন করছিলেন মহিলারা,











১
বিজ্ঞানী সত্যেন বসুর
সঙ্গে বালক ব্রহ্মচারী
২
রাজেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে বালক ব্রহ্মচারী
৩
পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে বালক ব্রহ্মচারী
৪
রাধাকৃষ্ণনের সঙ্গে বালক ব্রহ্মচারী
৫
বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে
বালক ব্রহ্মচারী

ওরাই রেঁধেছেন। চমৎকার রান্না! কিন্তু হায়, সাংবাদিকের কুচুটে কৌতূহল খেলছিল মগজে—টাকা পয়সা …বিরাট এই আশ্রমের খরচ…গৌরী সেন·

প্রশ্নটি করেই ফেললাম এক বিশিষ্ট কর্মীকে। 'কড়া চাবুকের' একটি সংখ্যা খুলে তিনি উদ্ধৃতি দিয়ে জানালেন—তারা কোন ডোনেশন নেন না। আশ্রমিকরা বাস করেন একটি যৌথ পরিবারে। এ পরিবারে আছেন ডাক্তার, এনজিনিয়ার, কৃষক, ছুতার মিস্ত্রি নানান জীবিকার 'সন্তান'। তাদের উপার্জিত অর্থেই এই পরিবার চলে।

এক সুন্দর ছবি ফুটে উঠছিল মনের চোখে। ছবিটা ঝাপসা করে দিলেন সুখচর পোস্ট অফিসের পোস্টম্যান। তিনি এসেছিলেন মানি অরডার দিতে। আড়ালে তাকে প্রশ্ন করতেই জানলাম, প্রতিদিন নানান জায়গা থেকে মিলিয়ে গড়ে শ দুয়েক টাকার মানি অরডার আসে এখানে! রেজিসট্রি এবং বীমাকৃত খামে কি আসে তা তিনি জানেন না।

রোদ ঝলমল দোতলার বারান্দায় এক কিশোরী অংক শিখছিল এক তরুণের কাছে। এ কিউব প্লাস বি কিউব। পাশে একটি ন/দশ বছরের ছেলেকে আর্যদের ভারতে আগমন বোঝাচ্ছিলেন এক প্রৌঢ়। একটু দূরে এক যুবতী ট্রানজিসটরে লো ভল্যুমে শুনছিলেন সুগম সঙ্গীত। জানলাম এরা কেউ কারো আত্মীয় নন, এক গুরুর শিষ্য। আর শিক্ষার্থী দুজনই পিতৃমাতৃহীন।

আশ্রমে যারা থাকেন, তাদের অনেকেই পারিবারিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত নন, কিংবা যোগসূত্র খুবই ক্ষীণ। চল্লিশোত্তর এমন পুরুষ আছেন যার স্ত্রী পুত্র কন্যা বর্তমান, কিন্তু যোগাযোগ নেই। এমন তরুণীও আছেন যাকে মা বাবা ভাই বোনের ছায়াবিধুর গৃহকোণ আর টানে না।

বিকেলে সন্তান দলের জিপে চড়ে গেলাম চব্বিশ পরগণার ·গঞ্জ শহরটিতে। সন্তান দলের মিটিঙে। জন সমাবেশ হয়েছিল হাজার দুই লোকের। সন্তান দলের ব্যাজ-আঁটা এক তরুণ উদ্যোক্তা একটি রাজনৈতিক দলের নাম করে গর্বের সঙ্গে জানালেন, ওদের মিটিঙেও এখানে এতো ভিড় হয় না।

আগুন-ঝরানো বক্তৃতা। অসুর দমন করো। দেশে বৈদিক সভ্যতা কায়েম করো। মহাকাশ থেকে তারা তোমাদের মুখ চেয়ে আছে



মহাকাশের সুরে সুর মেলাও।—শ্রীবালক ব্রহ্মচারী অবশ্যই একজন সুবক্তা।

জেনারেটার মেশিন চলছিল। সে মেশিনের সামনে জলা বালবের নিচে বসে নোট নিচ্ছিলাম। খুব ডিসটারব করছিল মেশিন। আলো কমছিল,বাড়ছিল। ব্যাজ আঁটা এক মধ্যবয়সী সন্তান কর্মী এসে আমাকেই ইলেকট্রিশিয়ান ঠাউরে বললেন ঃ ...বাচ্চা, মেশিন ঠিক করতে পারছো না।

পরিচয় দিতে দুঃখপ্রকাশ করলেন তিনি। কিন্তু বেশ আহত বোধ করলাম—বেদের নীতিতে যারা সমাজ বদল করবেন, শ্রমিকদের তারাও কি কটুক্তিই করবেন ?

❄

আজ যে বাড়িটি সন্তান দলের মূলকেন্দ্র, সুখচরের সেই বালক ব্রহ্মচারীধাম নির্মাণ করেছিলেন এক খ্যাতনামা বাঙালী নরসিংহ দত্ত, যার নামে হাওড়ার নরসিংহ দত্ত কলেজ। তারপর কয়েকবার মালিক বদল হবার পর ষাট দশকের শেষভাগে সে বাড়িটি কেনেন শ্রীমতী অঞ্জনা ঘোষ। শ্রীমতী ঘোষ বালক ব্রহ্মচারীর শিষ্যা। শুরু হলো আশ্রম পর্ব। বালক ব্রহ্মচারী নামটি সাধারণ মানুষের মনে ছড়িয়ে পড়ার বড়ো কারণ হিসেবে একটি মামলার কথা বলা যায় ঃ বিধবা শৈলবালা সাহার জমি সম্পত্তি দখলের মামলা। হাই-কোরটের রায়ে অভিযুক্ত শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ওরফে শ্রীবালক ব্রহ্মচারী বেকসুর খালাস পান। দৈনিক সংবাদপত্রে সে সময় আইন আদালতের কলামে এই মামলার বিবরণ ছিল সাধারণের কাছে গরম খবর।

ঢাকার মেদিনী মণ্ডল গ্রামে ১৯২০ সালে বীরেন্দ্রনাথের জন্ম। স্কুল কলেজের শিক্ষা তিনি গ্রহণ করেননি। ১৪ বছর বয়েসে তিনি গৃহত্যাগ করেন। বেশ কয়েক বছর তার কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। দু একজন বয়স্ক ভক্ত আমাকে বলেছেন সে সময় তিনি কাশীতে বেদ উপনিষদ অধ্যয়ন করেছিলেন। পূর্ণবয়স্ক বীরেন্দ্রনাথ যখন ফিরে এলেন তখন তিনি বালক ব্রহ্মচারী। তখন থেকেই নাকি নানান অলৌকিক ক্ষমতা তিনি দেখাতে শুরু করেন।

বিশ্বযুদ্ধ, দেশ বিভাগ ও স্বাধীনতা কালীন বছরগুলিতে তিনি কোথায় ছিলেন, কী করেছেন—তার কোন প্রামাণ্য তথ্য নেই।

বালক ব্রহ্মচারী ও পুলিশ

শুধু নেতাজী সুভাষ স্কোয়াড্রন নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়া আর 'বিধবার সম্পত্তি হরণের' মামলাই নয়, আরো বহুবার সন্তান দলের ও বালক ব্রহ্মচারীর কার্যকলাপে ছুটে এসেছে পুলিশ। থানাতল্লাসী, গ্রেফতার এসবও হয়েছে। অভিযোগ নানান ধরনের, সাম্প্রদায়িকতা ছড়ানো, অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখা এমন কি নারীঘটিত...ইত্যাদিও। সন্তান দলের মুখপত্রে তাদের বিরুদ্ধে এ সব অভিযোগ শুধু ভিত্তিহীন, মিথ্যাই বলে বলা হয়নি, বলা হয়েছে সন্তান দলের বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও ষড়যন্ত্রমূলক।

জরুরী অবস্থার সময় সংখ্যালঘু একটি সম্প্রদায়ের ধর্মসভায় সন্তান দলের একটি শাখা যোগ দিতে যায়। সেখানে দুটি দলের মধ্যে কথা কাটাকাটি ও হাতাহাতি হয়। দলের মুখপত্র 'কড়া চাবুক' তাদের ১ ডিসেমবর ৭৯ সংখ্যায় লিখেছেন, 'সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার আর্মড পুলিশ তৎপর হয়ে উঠল। আমার ধাম সাফ্‌চ করা শুরু হল। সমস্ত জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড। ছেলেরা কিছুই জানে না। অথচ তাদের ৩০/৩৫ জনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল।'

এছাড়া অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখা, আরো অনেক অভিযোগে বারবার এসেছে পুলিশ। 'কড়া চাবুক' পত্রিকায় বালক ব্রহ্মচারী লিখেছেন ঃ

'বহুবার নানাভাবে আমাদের নাজেহাল করার চেষ্টা করা হয়েছে। কেউ হয়তো রিপোর্ট দিয়েছে, এখানে নানা অস্ত্রশস্ত্র মজুত করা আছে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এসে যন্ত্র দিয়ে দিয়ে দেখেছে অস্ত্রশস্ত্রের সন্ধান পাওয়া যায় কিনা।' (কড়া চাবুক/১ ডিসেমবর, ৭৯)

'পাম এভিনিউতে থাকাকালীন কে একবার নালিশ করেছিল, আমার কাছে অনেক মেয়েরা থাকে, সে কথা শুনে আমাকে একেবারে হাতে নাতে ধরে ফেলার জন্য অতর্কিতে শ' তিনেক পুলিশ বাড়ীটি ঘেরাও করে ফেললো।' (ঐ)

পুলিশের সঙ্গে বালক ব্রহ্মচারী ও সন্তান দলের এমন সব তিক্ত সম্পর্ক থাকলেও, বালক ব্রহ্মচারীর কয়েকজন পুলিশ ভক্তও আছে। কলকাতা পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত এক পদস্থ অফিসারের গাড়ি মাঝে মধ্যেই সুখচর আশ্রমে দেখা গেছে।



নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে তার সম্পর্ক নিবিড়—একথা তিনি ও সন্তান দলের কর্মীরা অহরহ ঘোষণা করে থাকেন। কিন্তু নেতাজী বা নেতাজীর কোন রাজনৈতিক সহকর্মীর লেখা কোন গ্রন্থে বা প্রামাণ্য চিঠিপত্রে বালক ব্রহ্মচারী বা বীরেন্দ্রনাথের উল্লেখ পাইনি। প্রসঙ্গত, নেতাজী অন্তর্ধান অনুসন্ধানে গঠিত খোসলা কমিশনে বক্তব্য রাখার ডাকে সাড়া দেননি ব্রহ্মচারী।

সুখচরে আসার আগে ব্রহ্মচারী থাকতেন পারক সারকাস অঞ্চলে। সন্তান দলের পূর্ব নাম ছিল নেতাজী সুভাষ স্কোয়াড্রন। সংক্ষেপে এন এস এস। রাষ্ট্রবিরোধী প্রচার এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নেহরুর নামে কুৎসা রটনার কারণে এন এস এস নিষিদ্ধ হয় প্রফুল্লচন্দ্র সেনের আমলে। নাম পালটে ষাট দশকের শেষদিকে আত্মপ্রকাশ করে 'সন্তান দল।' সন্তান দল এবং দলনায়ক ব্রহ্মচারী মহারাজের দাবি ঃ প্রফুল্লচন্দ্র সেন ভুল করে ছিলেন, এবং সেজন্য পরে দুঃখ প্রকাশও করেছেন প্রফুল্লবাবু। দলের মুখপত্রে বালক ব্রহ্মচারীর বক্তব্য ঃ 'তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন তিনিও আমাকে ভুল বুঝেছিলেন। গত ১৮ ফেবরুয়ারি ১৯৭৯ তিনি আমার এখানে এসেছিলেন এবং তিনি যে ভুল করেছিলেন, সে কথা সেদিন স্বীকার করলেন।' (কড়া চাবুক/৭ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা /১৪ অগ্রহায়ণ ১৩৮৬)

সন্তান দলের বক্তব্য, তারা রাজনীতি করেন না, রাজনীতির সঙ্গে জড়াতেও চান না। তাদের মুখপত্র কড়া চাবুক কিন্তু রাজনীতি নির্ভর। বারে বারেই তাতে আসে রাজনৈতিক নেতাদের নাম—শুধু এদেশের নয়, বিদেশের নেতারাও কড়া চাবুকের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছেন ঃ 'তোমাদের ব্রেজনেভ মনে হয়, ঈশ্বর সম্বন্ধে এতদিন বুঝেছিলেন, ঈশ্বর নেই, সব ফাঁকা। এখন তিনি বুঝেছেন ঈশ্বর আছেন এবং ত্রুটি করলে তিনি ক্ষমা করবেন না। (কড়া চাবুক/৭ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা/১৪ আশ্বিন ১৩৮৬)

'হো চি মিনের লোকজনের ওপরে চরম

অত্যাচার চলেছে। তারা বার বার এসে হো চি মিনকে বলছে, 'কমরেড অরডার দাও।' হো চি মিন, 'না, না, ওয়েট, আরও একটু অপেক্ষা কর।' (ঐ)

'আরও মনে পড়ছে দুই পূর্বতন নকসাল নেতার কথা। একজন তো আপনার কূলেই এসে ভিড়েছেন। আরেকজন শ্রীসৌরেন বসু তো কাগজের ইনটারভিউতে বলে বসেছেন। দু'জনেরই একই কথা যে,—১৯৭০ সাল নাগাদ যে গোপন ডেলিগেশনটি মাও-সে-তুং-এর সঙ্গে দেখা করে, তাদের তিনি নাকি বলেছিলেন—'কমরেড ভারতের মাটিতে আমদানী করা সাম্যবাদের বীজ বপন করতে যাবার আগে ভারতের ভাবধারা অর্থাৎ সংস্কৃতি বা দর্শন আর ইতিহাসগুলো ভালো করে বুঝে চিনে নাও—না হলে—কাজ হবে না।' (ঐ)

বালক ব্রহ্মচারী নিজেকে বামপন্থী বলে প্রচার করে থাকেন। মাও-সে-তুং, হো চি মিন তার আদর্শ। মাও সে তুঙের রেডবুকের ধরনে সন্তান দলেরও রয়েছে লাল বই। বইটি খুবই গোপনীয়। লাল মলাটে ব্রহ্মচারীর ছবি আঁকা। সন্তান দলের শুধুমাত্র বিশেষ কর্মীদের কাছে থাকে 'কি করা উচিত / কি না করা উচিত, নির্দেশ সম্বলিত এই পকেট বইটি। 'Following in the footsteps of Mao, he has produced a Red Book of DO'S AND DONT S' for his disciple. But it is classified as a secret doccument, and not available to the Public.' (BLITZ, May 5, 1979).

বালক ব্রহ্মচারীর আশ্রমে আসেন নানান মানুষ। 'মুনাফাখোর, পুঁজিপতিরা সমাজের পরগাছা' দেওয়াল লিখনে যে সন্তান দল কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন, সেই সন্তান দলের মূলকেন্দ্রে কিন্তু চর্বির পাহাড় বণিক সম্প্রদায়ের ভিড় কম নয়।

বহু রাজনৈতিক কর্মীর মতে সন্তান দলের পিছনে গভীর উদ্দেশ্য কাজ করছে। তাদের মতে, সন্তান দলের অনেক দেওয়াল লিখনই প্ররোচনামূলক। কলকাতার কাছেই এক শহরে একটি রাজনৈতিক দলের স্থানীয় নেতা তাদের পারটি অফিসের সামনে 'ঝড় আসছে —কোন দলই টিকবে না,' 'যারা হাঁ করে রাজনীতি করে তাদের মুখে তীরবিদ্ধ হবে' প্রভৃতি দেওয়াল লিখন দেখিয়ে এই প্রতিবেদককে জানিয়েছেন ঃ সন্তান দল তাদের পারটির বিরুদ্ধেই এসব লিখছে।

সন্তান দলের মূলকেন্দ্র ২৪ পরগণার সুখচরে। কিন্তু সুখচরেই বাতাস বইছে উল্টো দিকে। এই দল ও বালক ব্রহ্মচারী সম্পর্কে সুখচরবাসীদের নানান অভিযোগ। তারা গঠন করেছেন 'বিশে মারচ কমিটি।'

কি এই বিশে মারচ কমিটি?

রিকসা ছুটছে সুখচরের বালক ব্রহ্মচারী-ধামের দিকে। দেওয়ালে দেওয়ালে সন্তান দলের লিখনের ভেতর দেখলাম উঁকি দিচ্ছে অন্য রং। লিংকনের সেই অবিস্মরণীয় উক্তি ঃ 'কিছু মানুষকে সারাজীবন বোকা বানানো যায়, কিন্তু সব মানুষকে সারাজীবন বোকা বানানো যায় না।'—লিখছেন, বিশে মারচ কমিটি। ওরা কারা? প্রশ্ন করতে সঙ্গী সন্তান দল কর্মীটি বললেন ঃ প্রদীপের নিচের অন্ধকার।

মন ভরলো না। জানি অন্ধকারেও কখনোসখনো ঝকমক করে সত্যের হীরা মানিক—যা প্রদীপ শিখাকেও ম্লান করে দেয়।

কাগজের অফিস থেকে এসেছি জেনে

প্রচার ব্যবস্থা

সুখচরে বালক ব্রহ্মচারী ধামে গেলে নিচের তলায় চোখে পড়বে একটি বিজ্ঞপ্তি ঃ শ্রীশ্রীঠাকুর বালক ব্রহ্মচারীর জীবনী ও বাণী অবলম্বনে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের জন্য যোগাযোগ করুন।

শুধু মফঃস্বল শহরেই নয়, দূর গ্রামাঞ্চলেও খোলা মাঠে সাদা স্ক্রিন টাঙিয়ে দেখানো হয় ব্রহ্মচারীর 'জীবন ও বাণী'। সাদাকালো, রঙিন ছবিও। দূর গ্রামে এসব ছবি দেখাতে সুখচর থেকে জিপ ছোটে প্রোজেকটর মেশিন আর ফিলমের ক্যান নিয়ে। খরচপাতি যে এলাকায় ফিলম দেখানো হবে সেই এলাকার 'সন্তান দলের'—অর্থাৎ সেই এলাকার সাধারণ নিম্ন মধ্যবিত্ত, দরিদ্র মানুষের যারা ব্রহ্মচারীর ভক্ত।

এসব শর্ট ফিলম তৈরির জন্য ব্রহ্মচারী বা তার দলের আছে একটি নিজস্ব ফিলম ইউনিট।

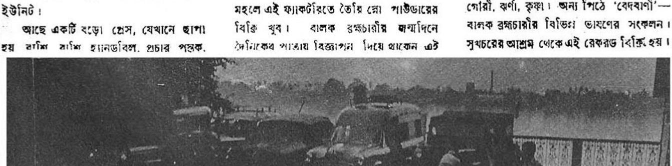
আছে একটি বড়ো প্রেস, যেখানে ছাপা হয় রাশি রাশি হ্যানডবিল, প্রচার পুস্তক, বালক ব্রহ্মচারীর ছবি ছাপা পোসটার··· এছাড়া বাইরের ছোট প্রেসগুলি থেকেও প্রয়োজনে এসব ছাপা হয়ে থাকে। ১৯৭৬এ, 'দ্রুত ছেপে দিতে হবে' চুক্তিতে খড়গপুরের একটি প্রেস থেকে ছাপা হয় সাড়ে চার লাখ হিন্দি হ্যানডবিল। ঐ সব হ্যানডবিল বিলি করতে ব্রহ্মচারীর নির্দেশে সেবার কয়েকজন সন্তানদল কর্মী গিয়েছিলেন প্রয়াগের কুম্ভমেলায়।

বালক ব্রহ্মচারীর আশ্রমের লন সব সময়ই দেশি বিদেশি গাড়ি, জিপে ছয়লাপ। এ সব গাড়ির অনেকগুলিই সন্তান দলের প্রচার কার্যে লাগে। এ ছাড়া সন্তান দলের পতাকা উড়িয়ে বালক ব্রহ্মচারী ধামের গঙ্গার ঘাটে মাঝেমধ্যেই আসে একটি মোটর লঞ্চ।

সন্তান দলের ডাকসাইটে কর্মীদের কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পপতি। এদেরই একজনের আছে একটি কসমেটিকসের ফ্যাক্টরি। ভক্তমহলে এই ফ্যাক্টরিতে তৈরি স্নো পাউডারের বিক্রি খুব। বালক ব্রহ্মচারীর জন্মদিনে দৈনিকের পাতায় বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকেন এই কসমেটিকস কোমপানি।

কি গ্রাম, কি শহর—ব্রহ্মচারীর ভক্তরা সকলেই বুকে আঁটেন বালক ব্রহ্মচারীর ছবি আঁকা ব্যাজ, গলায় পরেন 'ব্রহ্মচারী লকেট' চেন। বালক ব্রহ্মচারী ধামে এগুলি বিক্রি হয়, দলের লোকাল কমিটিও এসব বিক্রি করেন, দাম বারো আনা থেকে পাঁচ টাকা।

দমদমের গ্রামোফোন কোমপানি অব ইনডিয়াকে দিয়ে নিজেদের রেকরডও তৈরি করে নিয়েছেন সন্তান দল (Specially Manufactured by the Gramaphone Co. of India, Dum Dum), গৈরিক রঙের লেবেলে কালো হরফে বড়ো করে ছাপা রয়েছে দলের নাম। রেকরড নামবার 45-QC 1963, 7XJE6815 ও 7XJE 6816। এই রেকরডটির এক পিঠে রয়েছে ভক্তিগীতি রাম নারায়ণ রাম—গেয়েছেন অঞ্জনা চক্রবর্তী, সুধাময়, অসিত, নিতাই, গৌরী, ঝর্ণা, কৃষ্ণা। অন্য পিঠে 'বেদবাণী'—বালক ব্রহ্মচারীর বিভিন্ন ভাষণের সংকলন। সুখচরের আশ্রম থেকেই এই রেকরড বিক্রি হয়।



আশ্রমের লনে



হৃদয় দুটি ঘুরে বেড়াক গ্র্যামোফোনের ডিস্কে...

ভালো একটা উপহার খুঁজে পেতে আপনার আসল সমস্যাটা কোথায়? ভালো উপহার—যা আপনার পছন্দ, ভদ্রলোকটির আর অবশ্যই ভদ্রমহিলাটিরও—এমন কোনো কিছু কি আপনি খুঁজে পাচ্ছেন না?

আপনি রেকর্ডের কথা ভেবেছেন? এমন কি প্রত্যেক বিয়ের জন্য যদি আপনার আলাদা বাজেটও হয়, আপনার জন্য রয়েছে নানা দামের আর নানা রকমের রেকর্ড॥

ভদ্রলোকটি কি একটু নাক উঁচু? কিন্তু মহিলাটি অন্যরকম? আপনি নাটকের কথা ভাবতে পারেন॥ রাজা অয়দিপাউস, ডাকঘর, চোখে আঙুল দাদা বা মেঘনাদ বধ কাব্য—সবই তো পাওয়া যাচ্ছে ইনরেকো এল. পি. ডিস্কে॥

কিংবা গান? যা এঁর, ওঁর, তাঁর আর আপনারও খুবই পছন্দ॥ সায়গল, পঙ্কজ মল্লিক, শচীনদেব বর্মন, দেবব্রত বিশ্বাস, রাজেশ্বরী দত্ত, সুপ্রভা সরকার, ফিরোজা বেগম—অসংখ্য রেকর্ড থেকে আপনার মনের মত ডিস্কটি খুঁজে পেতে আপনারও ভালো লাগবে॥ ভেবে দেখুন, হয়তো কারো বিশেষ পছন্দ শান্তিদেব ঘোষ, সুবিনয় রায়, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন বসু কিংবা পূরবী দত্ত॥

আবৃত্তির কথা ভাবছেন? শম্ভু মিত্রের আবৃত্তির লং প্লে ডিস্কের চেয়ে ভালো উপহার কিছু আছে কি? আর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তির রেকর্ডও তো রয়েছে॥

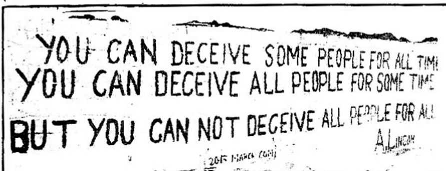
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে কারো যদি বিশেষ রুচি থাকে তবে বড়ে গুলাম আলী খাঁ বা ফৈয়াজ খাঁ এর একটা রেকর্ডই কিনে ফেলুন না কেন? অথবা আমীর খাঁ, গাঙ্গুবাই হাঙ্গল, মল্লিকার্জুন মনসুর, কুমার গন্ধর্ব কিংবা বুধাদিত্য মুখোপাধ্যায়?

এরপরেও আপনি দেখতে পারেন আমাদের আধুনিক গান বা পল্লীগীতির সংগ্রহ॥ যেমনই হোক আপনাদের রুচির বৈচিত্র তা আমাদের বিস্মিত হবার সুযোগ দেয় না—এই হোল আমাদের গর্ব করে বলার মত প্রস্তুতি॥ আপনার রুচি আর সংস্কৃতির সঠিক প্রতিফলনের জন্য উপহার দিন ইনরেকো রেকর্ড॥

IRM/SD/80/3

হিন্দুস্থান আর ইনরেকো রেকর্ড

—আপনার উপহার-সমস্যার সেরা সমাধান॥



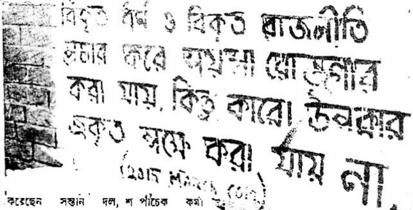
'এলেন শুভ্রকেশ বৃদ্ধ, এলেন বুদ্ধিদীপ্ত তরুণ। তারা সকলেই বিশে মারচ কমিটির সদস্য। জানালেন এই কমিটিতে সব রাজনৈতিক দলেরই সদস্য আছেন। উদ্দেশ্য : ধর্মের নামে ভ্রষ্টাচার দূর করা।

বালক ব্রহ্মচারী ও আশ্রম-বাসীদের সম্পর্কে স্থানীয় অধিবাসীদের প্রথম তিক্ততা এ অঞ্চলের প্রধানতম সড়ক নরসিংহ দত্ত ঘাট রোডের নাম পরিবর্তন করার চেষ্টা নিয়ে। সন্তান দল কর্মীরা রাস্তায় নিজেরাই যত্রতত্র ফলক আঁটছিলেন—'ঠাকুর বালক ব্রহ্মচারী রোড'। '৭২-এর শেষদিকে পানিহাটি পৌরসভায় আশ্রম থেকে আবেদনও করা হলো রাস্তার নাম পরিবর্তনের জন্যে। বাদ সাধলেন স্থানীয় জনসাধারণ। 'মাস' পিটিশন দিলেন তারা। রাস্তার নাম বদল হলো না।

এরপর পোসট অফিস। জনসাধারণ দেখলেন আশ্রমে আসা চিঠিপত্রে পোসট অফিস হিসেবে উল্লেখ করা হচ্ছে 'বালক ব্রহ্মচারী ডাকঘর'। আবার পিটিশন, সুখচর পোসট অফিস জানালেন 'বালক ব্রহ্মচারী ডাকঘর' লেখা থাকলে সে চিঠিপত্র তারা আর বিলি করবেন না।

১৯৭৮এ দোলের দিন রং দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে আশ্রমবাসী তরুণদের সঙ্গে স্থানীয় তরুণদের একটি সংঘর্ষ ঘটে। আসে পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ : আশ্রমের কয়েকজন ছিলেন মত্ত অবস্থায়। পুলিশের মধ্যস্থতায়, বালক ব্রহ্মচারীর উপস্থিতিতে স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়ে একটি আলোচনা সভা হয় দোলের পরের দিন সন্ধ্যায়। গঠিত হয় 'শান্তি কমিটি'। শান্তি কমিটিতে জনা কুড়ি স্থানীয় সদস্যের সঙ্গে ছিলেন পাঁচজন আশ্রমবাসীও। কিন্তু পরবর্তী কালে দেখা যায় শান্তি কমিটির কোন মতামতই গ্রহণ করছে না আশ্রম। ফলে প্রথমে অকেজো, পরে বাতিল হয়ে যায় সেই শান্তি কমিটি।

১৯৭৯র দোলের আগে শান্তিরক্ষার আবেদন জানিয়ে খড়দহ থানায় চিঠি লেখেন স্থানীয় জনসাধারণ। কিন্তু দোলের আগেই ১১ মারচ সুখচরের হাওয়া বাতাস গমগম করে উঠলো মিছিলে, শ্লোগানে। মিছিল বার



করেছেন সন্তান দল, শ পাঁচেক কর্মী (অভিযোগ, তারা বাইরে থেকে আসা), হাতে ত্রিশূল, মুখে আওয়াজ : মুণ্ডু চাই।

এর প্রতিবাদে ২০ মারচ ১৯৭৯ স্থানীয় জনসাধারণের ডাকে সর্বদলীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্থানীয় বিধানসভা-সদস্য গোপাল কৃষ্ণ ভট্টাচার্য বক্তব্য রাখেন জনসাধারণের সমর্থনে। সে সভায় এসে-ছিলেন এলাকার আবালবৃদ্ধবনিতা। সি পি আই এম, ইন্দিরা কংগ্রেস, জনতা, নকশালপন্থী, সি পি আই ও অন্যান্য দলের স্থানীয় নেতারা ঐ সভায় গঠন করেন সর্বদলীয় 'বিশে মারচ কমিটি'।

'বিশে মারচ কমিটি' শ্রীবালক ব্রহ্মচারীকে আলোচনায় বসার অনুরোধ জানিয়ে ২৩ মে '৭৯ রেজিসটারড ডাকে চিঠি দেন। কিন্তু বালক ব্রহ্মচারী ফিরিয়ে দেন সেই চিঠি।

এরপর বিশে মারচ কমিটি গণস্বাক্ষর সম্বলিত অভিযোগপত্র পাঠান মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে। এ ছাড়াও তারা সমস্ত রাজনৈতিক দলের রাজ্য কমিটিগুলিকেও চিঠি লিখে তাদের বক্তব্য জানিয়েছেন।

সুখচরের বাতাস এখন ঠিক এই থমথমে অবস্থায় আটকে আছে। বিশে মারচ কমিটি বলছেন : ধর্মের নামে সন্তান দলের পিছনে আছে গভীর রাজনৈতিক অভিসন্ধি। সন্তান দল লিখছে : ষড়যন্ত্রকারীরা সাবধান।

❋

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে বহু মহাপুরুষ জন্মেছেন। বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, শঙ্করাচার্য, গুরু নানক থেকে শুরু করে রামকৃষ্ণদেব, বিবেকানন্দ, হাজী মহম্মদ মহসীন, বামাক্ষেপা, ত্রৈলঙ্গ স্বামী, শ্রীঅরবিন্দ—হাজার মহাপুরুষের চরণধূলা মিশে আছে এ মাটিতে। তারা কেউই এমন আত্মঘোষণা কখনো করেননি যে তারা মহা-পুরুষ। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত গৃহকোণে বসে 'সমাজ বদলের' মন্ত্র শোনাননি তারা কেউ। স্বয়ং রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন, 'ওরে, গুরুকেও বাজিয়ে নিস।

সুখচরের বালক ব্রহ্মচারী ধামে গিয়েছি বেশ কয়েকবার, গিয়েছি সন্তান দলের মিটিঙে, কথা বলেছি সন্তান দল কর্মীদের সঙ্গে, খুঁটিয়ে পড়েছি তাদের বইপত্র, ইস্তাহার। আবেগ আবেগ আর আবেগ—যুক্তি নেই, সমস্তই কেমন যেন অপার্থিব কুয়াশা। শুধু ধর্ম হলে হয়তো ক্ষতি ছিলো না, রাজনীতিরও বেশ ছোঁয়া রয়েছে যে তাতে! প্রশ্ন জাগে সন্তান দল কর্মীদের মধ্যে উচ্চবিত্ত ব্যবসায়ীরা থাকলেও, তাদের বিরাট অংশই তো মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত—'আমার এক হাতে বারুদ অন্য হাতে দেশলাই কাঠি' এই গা-গরম শ্লোগান দিয়ে ব্রহ্মচারী কোথায় নিয়ে চলেছেন তাদের ?



শতাব্দীর ঐতিহ্যসম্পন্ন মেডিকেল-কলেজ এখন নিজেই মুমূর্ষু রোগী

কথামালার গল্পে গুহায় নিহিত বৃদ্ধ সিংহের আমন্ত্রণ শুনে যেসব প্রাণীরা একবার সে গুহায় ঢুকত তারা আর বেরুতো না। ভারতবর্ষের অন্যতম প্রাচীন মেডিকেল কলেজ ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজের অবস্থাও আজ ঠিক সেই বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত সিংহের মত। অবশ্য চিকিৎসার আশায় যারা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন তারা সকলেই ফেরেন না, একথা বলে সত্যের অপলাপ ঘটানো উচিত হবেনা। ১৯৭৯ সালে ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজে ৪২,৫৮৫ জন রোগী ভর্তি হয়েছিলেন। তার মধ্যে শুধু ৪২৮৭ জন রোগী আর বাড়ি ফিরতে পারেননি। হাসপাতাল থেকে তারা সোজা মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করেছেন। অর্থাৎ প্রতি দশজন রোগীর মধ্যে একজন রোগীর সেখানে মোক্ষলাভ ঘটেছে।

সহস্রমারী যারা মেডিকেল কলেজের বৈদ্য তারা এই কথায় প্রতিবাদ জানিয়ে বলবেন: মৃত্যুর পরিসংখ্যান দিয়ে কোন হাসপাতালের কোয়ালিটি বিচার করাটা অবৈজ্ঞানিক। যার পরপারের ডাক এসেছে তাকে বাঁচায় কেডা? কিন্তু যদি বিন্দুমাত্র প্রমাণ পাওয়া যেত ভারতবর্ষের এই সুপ্রাচীন হাসপাতালে রোগী ভর্তি হওয়া মাত্র তার রোগ নির্ণয়ের ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তার পরিচর্যা, শুশ্রূষার মধ্যে মানবিক স্পর্শ থাকে, তার শয্যা পরিবেশ অন্তত আর যাই হোক একটি আরোগ্য নিকেতনের উপযোগী; যদি নামী ও দীর্ঘ ডিগ্রিধারী চিকিৎসককুল তাবৎ রোগীর পিছনে সমান উৎসাহ ও আনুকূল্য দেখিয়ে থাকেন তাহলে সমস্ত মৃত্যুই স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া যেত। কিন্তু কলকাতা মেডিকেল কলেজের ভেতরে ঢুকলে তার বিপরীত ছবিটাই ফুটে ওঠে। তখন ভাবতে কষ্ট হয়—১৪৫ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজ (১৮৩৫) একদা ভারতবর্ষের গর্ব ছিল। ছিল বাঙালীর রেনেসাঁসের এক উজ্জ্বল দীপালোক। আজ সে দীপ নির্বাপিত।

ইহার নাম মেডিকেল কলেজ

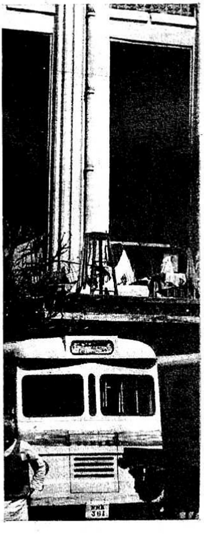
যদি কোনদিন পর্যটন দফতরের বাস কলেজ স্ট্রীট ধরে এগিয়ে চলে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে তাহলে বাঁদিকের বিরাট বিরাট লাল বাড়িগুলিকে 'ইহা মেডিকেল কলেজ' বলে না চিনিয়ে দিলে পর্যটকেরা ওটিকে চতুর্থ শ্রেণীর রেল কর্মচারীদের কোয়াটারস বলে ভুল করতে পারেন। গাইড যেন ওই সময় বাসের সমস্ত জানালা বন্ধ করে রাখতে বলেন:

পরিবর্তন নিউজ ব্যুরো

কারণ মেডিকেল কলেজের রেলিং ঘেঁসে মানব শিশুর উৎপন্ন যাবতীয় নিত্যক্রিয়া পদ্ধতির পরিণাম ওখানেই জমা হয়ে থাকে। তার গন্ধে পর্যটকদের প্রাণ আকুল হয়ে উঠতে পারে। প্রধান তোরণের ভেতর দিয়ে ঢুকলে অবশ্য বোঝা যায় ওটা হাসপাতাল। কিন্তু ভেতর দিয়ে কিছুক্ষণ হাঁটলেই বোঝা যায় কী নিদারুণ জরাগ্রস্ত অবস্থায় গোটা চত্বরটা দাঁড়িয়ে আছে!

প্রহসনের নাম আউটডোর

মেডিকেল কলেজে প্রতিদিন সকাল থেকে একটি প্রহসন পালা অভিনয় হয়, তার নাম আউটডোর। পিলপিল করে গরিব মানুষেরা চিকিৎসার আশায় আউটডোরে আসেন। প্রতিদিনে এমন হাজিরা দাতার সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। সারা বছরে (১৯৭৯) ১০,৮৫,৬৮৫ জন রোগীকে নাকি আউটডোরে 'চিকিৎসা' করা হয়েছে।



CMDA-র দেওয়া গাড়ি বেশিরভাগ সময় হাসপাতালের সামনে শোভা পায়

রোগীরা প্রথমে আউটডোরে এসে টিকিটের জন্য কিউ দেন। দীর্ঘ কিউতে গড়ে দাঁড়াতে হয় দু'ঘণ্টা। সে কিউ শেষ হলে আবার আর একটি কিউ। কর্তব্যরত ডাক্তারবাবুকে দেখাবার জন্য। সরকারী পরিসংখ্যান হল রোগী পিছু বরাদ্দ ১ মিনিট। এর মধ্যে ডাক্তারবাবু তার রোগ নির্ণয় থেকে শুরু করে টিকিটে ওষুধের নাম লেখা পর্যন্ত যাবতীয় কাজ ঝটপট করে ফেলেন। এ ব্যাপারে তাদের ক্ষিপ্রতা যে কোন অতি মানবকেও হার মানিয়ে দেয়। যদি রোগীর কোন প্যাথলজিক্যাল টেসটের দরকার হয় তাহলে রোগীকে আবার আর একদিন কাকভোরে এসে টিকিটের জন্য লাইন দিতে হয় এবং ওইভাবেই কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় পরীক্ষিত হতে হয়। তারপর এক সপ্তাহ বা তার পরে আর একদিন এসে রিপোরট নিতে হয়। রিপোরট ডাক্তারবাবুকে দেখাতে গেলে লাগে আর একদিন। এর মধ্যে যদি এক্সরে করার দরকার হয় তো হয়ে গেল! সিমপল এক্সরে হলে বলা হয় তিন-চারদিন পরে আসতে। স্পেশাল এক্সরে হলে তারিখ পেতে লাগে দুতিন সপ্তাহ। কিন্তু সেই তারিখে এলে যে এক্সরে হবেই এর গ্যারানটি কেউ দিতে পারেন না। কারণ প্রায়ই দেখা যায় এক্সরে ফিলমের সাপলাই নেই। যে ঝরঝরে কয়েকটি মেশিন দিয়ে কাজ চলে সেগুলিও প্রায়ই খারাপ থাকে।

আজকাল যে কোন আধুনিক হাসপাতালেই থাকে ভাঙা হাড়ের ছবি দেখার উপযোগী টিভি স্ক্রিনিং যন্ত্র। কিন্তু মেডিকেল কলেজে এই যন্ত্র নেই। এক্সরেই ওদের একমাত্র ভরসা। আর ওই এক্সরে রিপোরট (যা আধ ঘণ্টার মধ্যেই পাবার কথা) পেতে একজন রোগীকে অপেক্ষা করতে হয় আরও ৭ থেকে ১২ দিন। এর ফলে রিপোরট যখন আসে এবং সে রিপোরট নিয়ে একজন ফ্র্যাকচারড 'বোনের' রোগী খোঁড়াতে খোঁড়াতে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে যখন দেখা করেন তখন টু লেট। রোগীকে অপারেশন করা ছাড়া তখন আর গত্যন্তর থাকে না। অথচ সঙ্গে সঙ্গে এক্সরে রিপোরট পেয়ে চিকিৎসা হলে এই অপারেশনের হয়ত প্রয়োজন হত না। একটু সম্পন্ন রোগী পয়সা দিয়ে বাইরে থেকে এক্সরে করিয়ে আনেন। কিন্তু যাদের সে পয়সা নেই তারা এই ভাবেই দিনের পর দিন ঘুরতে থাকেন।

বায়োকেমিসট্রির রিপোরট ভুল

'মেডিকেল কলেজের বায়োকেমিসট্রি বিভাগের রিপোরট অনেক সময়েই ভুল হয়।' মেডিকেল কলেজ স্টুডেনটস ইউনিয়নের সমীক্ষায় এই তথ্য ধরা পড়েছে। এই বিভাগের জন্য বরাদ্দ ১০ বাই ৬ ফুট একটি ঘর। এই ঘরে একজন টেকনিসিয়ানকে দিনে ৬০/৭০টি একসপেরিমেনট করতে হয়। এ কারণে তার 'মাথার ঠিক' রাখা সম্ভব হয় না। এখানে যে সেনট্রিফিউজ মেশিনটি আছে সেটিও অধিকাংশ সময় বিকল থাকে। প্রয়োজনীয় টেসটটিউব,রিএজেনটস সব সময়ই বাড়ন্ত, যা পাওয়া যায় আদপে তা নিচু মানের। বিভাগের একটি মাত্র ডি সি ফ্রিজ; তাও সাত বছর ধরে খারাপ হয়ে পড়েছিল। কিছুকাল আগে সেটি সারানো হয়েছে। তাও প্রায়ই সেটি বিগড়ে যায়। মজার কথা—একটি এ সি ফ্রিজ এসে পড়ে আছে, অথচ এ সি লাইনই নেই।

ওষুধের জন্য বরাদ্দ ২৫ পয়সা

মেডিকেল কলেজের আউটডোর রোগী-পিছু ওষুধের জন্য বরাদ্দ ২৫ পয়সা।

মেডিকেল কলেজ-হাসপাতাল	
শয্যা সংখ্যা	১.৫৪৬
ফ্রি বেড	১,২৯৯
পেয়িং বেড	১৯৩
কেবিন	৫৪
১৯৭৯ সালে রোগী ভরতির সংখ্যা	৪২,৫৮৫
ঐ বছর আউটডোর রোগী	১০,৮৫,৬৮৫
ডেলিভারি কেসের সংখ্যা	১০,৩৩৩
স্টুডেনট নারস	৩০০
স্টাফ নারস	৪১৪
চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী	১,৪৭৩
মেডিকেল অফিসার	১৪৬
রেডিওগ্রাফার	২৯
অ্যানেসথেটিসটস	২৬

১৫ লক্ষ টাকা দেনা। হাসপাতালে ওষুধের জন্যও লাইন দিতে হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। দু-তিন ঘণ্টা লাইন দেবার পর রোগীরা হয়ত শোনেন যে অমুক ওষুধ নেই।

হাসপাতালে এই ওষুধ বণ্টন নিয়ে নানান দুর্নীতির অভিযোগের অন্ত নেই। করে দেয়। এজন্য বিভিন্ন ওষুধের দোকানের সঙ্গে তাদের ব্যবস্থা আছে।

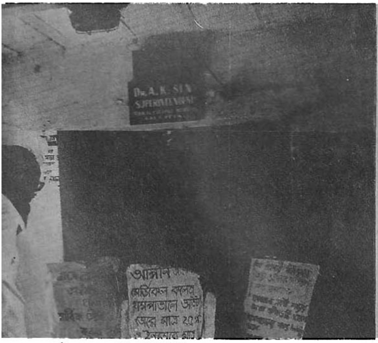
কিছুকাল ধরে মেডিকেল কলেজে চলছে ওষুধ সংকট। টাকা বাকি পড়ায় মে অ্যানড বেকার অপারেশন থিয়েটারে অ্যানাসথেসিয়া দেওয়ার ওষুধপত্র সরবরাহও বন্ধ করে দিয়েছেন।

প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহের ব্যাপারেও সরকারও এখন হাত গুটিয়ে নিচ্ছেন।

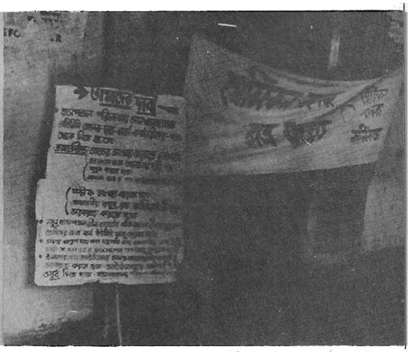
গত ৬.১১.৭৯ তারিখে এক গোপন সারকুলারে (নং ৪।১৪।২৫৪৬৭ (১০০) ৬.১১.৭৯) সরকার বলেছেন—একমাত্র ক্রিসটালিন পেনিসিলিন, সালফা ড্রাগ ও স্ট্রেপটোমাইসিন ছাড়া সমস্ত অ্যানটি-বায়োটিকস ও ব্রডস্পেকট্রাম ড্রাগ হাসপাতাল থেকে আর দেওয়া হবে না।

হাসপাতালের বেড

'পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত আপামর জনসাধারণের মনে মেডিকেল কলেজ সম্পর্কে এখনও এক অন্ধ বিশ্বাস রয়েছে। এ বিশ্বাসটা হল একবার ওখানে ভরতি হতে পারলে রোগ-মুক্তি ঘটবেই। কিন্তু বড় ডাক্তারবাবুর অনুগ্রহ



মেডিকেল ছাত্রদের দাবিদাওয়া



মেডিকেল ছাত্রদের প্রতীক ধর্মঘট

ইনডোর রোগীরা অবশ্য ভাগ্যবান। তাদের জন্য বরাদ্দ দিনে ১ টাকা। বছরের পর বছর ধরে এই বাজেটের পরিবর্তন নেই। কিন্তু কার্যত ওষুধের খরচ পড়ে আউটডোর রোগীদের জন্য ৩ টাকা ও ইনডোর রোগীর জন্য ১৫ টাকা। এই টাকার দায়ভাগ নিতে হয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে। এর ফলে ওষুধ কোমপানির কাছে হাসপাতালের এখন

ওই কলেজের অভ্যন্তরে এক পেশাদারি দুষ্ট চক্র ও আড়কাটি শ্রেণী বছরের পর বছর কাজ করে যাচ্ছে। এরা আউটডোরের রোগীর কাছ থেকে টাকা নিয়ে তাকে আগে আগে দেখাবার ব্যবস্থা করে দেয়। এরা নিজেরা রোগী সেজে বা নিজেদের লোকদের প্রতিদিন রোগী সাজিয়ে কিউয়ে ঢুকিয়ে দেয়। তারপর তারা যে ওষুধটি পায় সেটি বিক্রি

বা মহাকরণের নির্দেশ না থাকলে সহায়-সম্বলহীন মানুষের পক্ষে মেডিকেল কলেজে ভরতি হওয়া দুরাশা। ই এন টি-তে আউটডোরে দেখাবার পর একজন রোগীকে এখন বেড পেতে গেলে দেড় বছর অপেক্ষা করতে হয়। অন্যান্য বিভাগে অপেক্ষার মেয়াদ দু' মাস থেকে ছ' মাস। এমারজেনসি কেসের কথা আলাদা। কিন্তু সেখানে

বেডের অভাবে রোগী মেঝের ওপর এমনকি খোলা বারান্দায় শুয়ে থাকেন। সরকারী ভাবে কলেজে বেডের সংখ্যা ১৫৪৬। কিন্তু রোগী থাকেন ১৭০০ মত। প্রসূতি ওয়ারড ইডেন হাসপাতালে গেলে দেখা যায় একটি বেডে দু'জন করে প্রসূতি শুয়ে। অনেক সময় একজন মেঝেয় পড়ে থাকা রোগী কোনও বেডের রোগীর মৃত্যুর অপেক্ষা করেন, কারণ তাহলে তিনি হয়ত ওই বেডটি পাবেন। একটি মানুষের তিনটি মাথার মতই বিস্ময়কর দৃশ্য এখানে প্রায়ই দেখা যায় একটি বেডে সদ্যোজাত শিশুসহ তিনজন করে প্রসূতি শুয়ে আছেন।

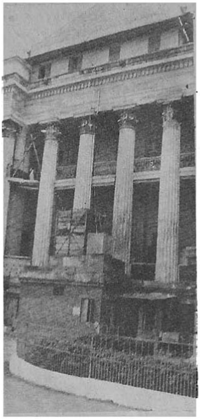
এই হাসপাতালে এখন এক অপূর্ব সাম্য বিরাজমান। সুস্থ ও রোগাক্রান্ত শিশুদের এই হাসপাতালে রেখে দেওয়া হয় পাশাপাশি। সাম্য নীতির এই অভিনব প্রয়োগের ফলে সুস্থ শিশুটিও অবশেষে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

পুষ্টি বিশেষজ্ঞরা বলেন একজন সুস্থ লোকের দিনে ৩,০০০ ক্যালোরি খাদ্য লাগে। অসুস্থ লোকের দরকার আরও বেশি ক্যালরি। কিন্তু মেডিকেল কলেজের হাসপাতালে একজন রোগী পান দেড় হাজার ক্যালরি। তাকে অর্ধেক ত্যাগ করে তবেই এই হাসপাতালে আসতে হয়। কারণ তার জন্য বরাদ্দ মাথা পিছু ৩ টাকা। এর মধ্যে অবশ্য বিভিন্ন অদৃশ্য হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি। অবশ্য রোগীর দানাপানি চুরি বই চুরির মতই এদেশে এখন ধর্তব্য বিষয় নয়। টি বি রোগীদের জন্য বরাদ্দ দিনে সাড়ে তিন টাকা।

কিন্তু তাদের খাদ্যের চেয়ে ভয়াবহ হল থাকবার ওয়ারডটি। সেখানকার অস্বাস্থ্যকর ঘরের প্রতিটি দেওয়ালে দেখা যায় রক্তের ছাপ। সে ঘরে ঢুকতে ভয় করে। অতবড় হাসপাতালে কোন বার্ন ওয়ারড নেই। অথচ প্রতিদিন মেডিকেল কলেজে আগুনে পোড়া কেস আসে পাঁচ-ছটি করে। এই হতভাগ্য অগ্নিদগ্ধদের জীবন্ত দগ্ধ হতে হয় মনোবেদনায়। তাদের ঠাঁই হয় বারান্দার এক কোণে। এদের আলো হাওয়ার অবশ্য কোন অভাব থাকে না। কিন্তু চিকিৎসকরা বলেন: এইসব রোগীদের আলো-হাওয়াই হল শত্রু। কারণ তাতে দগ্ধ ঘায়ে সংক্রমণ লাগার সম্ভাবনা।

এমারজেন্সির হাল

জনতা সরকার ক্ষমতায় আসার পর কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজনারায়ণ নাকি হাসপাতালে ঢুকে 'এমারজেন্সি' শব্দটি দেখে খুব রেগে গিয়ে বলেছিলেন—হাসপাতালে



হাসপাতালের এমারজেন্সির মেশিন খারাপ

এখনও এমারজেন্সি রয়ে গেছে দেখছি! এটা তুলে দিতে হবে, এটা নেহাৎই কৌতুক। কিন্তু মেডিকেল কলেজ থেকে 'এমারজেন্সি' শব্দটি তুলে দিলে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হত না কারণ এ বিভাগটির যে কোন আরজেন্সি আছে তা সরকার মনে করেন না। এমারজেন্সিতে প্রয়োজনীয় লোক নেই। তাই ওখানকার একস্‌রে সব সময় চলে না। যদি কেউ দুর্ঘটনায় আহত হয়ে মেডিকেল কলেজ এমারজেন্সিতে আসেন তাহলে তিনি যেন হিসাব করে আহত হন যাতে সেই সময় মেডিকেল কলেজের এমারজেন্সি একস্‌রে ইউনিট সচল থাকে এবং সচল থাকলেও যেন অপারেটর অন ডিউটি থাকেন। ই সি জি মেশিন এই নিবন্ধ লেখার সময় একমাস ধরে খারাপ। মুমূর্ষু হারটের রোগীদের বলে দেওয়া হচ্ছিল—অন্য দরজা দেখতে। যদি কেউ বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবেনই মনস্থ করে থাকেন তাহলে তিনি যেন আত্মীয় স্বজনদের বলে রাখেন—'আমাকে দয়া করে মেডিকেল কলেজের এমারজেন্সিতে নিয়ে যাবেন।' কারণ ওখানে গেলে ওদের নড়বড়ে 'সাকার মেশিন' কাজ করবে না এবং তার সেই কাম্য ও পরম অভিপ্রেত মৃত্যু অতি নির্বিঘ্নেই নিকটবর্তী হবে। মুমূর্ষু রোগীর জন্য দরকার অকসিজেন সিলিনডার? এমারজেন্সি কিন্তু তারও কোন গ্যারানটি দিতে পারবে না। যীশু যেমন মৃত্যুকালে নিজের ক্রুশ নিজে বহন করেছিলেন তেমনি মেডিকেল এমারজেন্সিতে ভরতির সময় নিজের সিলিনডার নিজে বহন করলেই ভাল হয়। আরটিফিসিয়াল রেসপিরেটরও কিন্তু এমারজেন্সিতে নেই। ওটা সঙ্গে করে নিয়ে এলেই ভাল। আর এমারজেন্সি ওয়ারডে আপনার দেহে কোন হাউস সারজেন যদি ইনজেকশন দেন এবং তাতে যদি আপনি বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা অনুভব করেন তাহলে ওই হতভাগ্য হাউস সারজেনের ওপর দোহাই রাগ করবেন না, কারণ সামান্য ইনজেকশনের সূচও তারা নিয়মিত পান না, কাজেই পুরনো দিয়েই কাজ চালাতে হয়।

বিষে বিষক্ষয়ের জন্য এমারজেন্সিতে মজুদ রাখতে হয় ডেটুরা, প্রায়ই তার স্টক থাকে না। হাসপাতালে কোন রোগীর রক্ত দরকার হলে তার জন্য হাসপাতাল চত্বরের বিরাট ব্লাড ব্যাংক কোন কাজে আসে না। কারণ হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংক শুধু ডোনারদেরই রক্ত দেন। বাকি রোগীদের রক্ত কিনতে হয় প্রাইভেট হাসপাতাল ও নারসিং হোম থেকে। সেখানে এক বোতল রক্তের দাম ১০০ থেকে ১২০ টাকা। তাও সেখানে সর্বদা ভি ডি আর এল পরীক্ষা করে রক্ত গ্রহণ করা হয় না। কাজেই এসব রক্তে অনেক সময় বিপদ ডেকে আনতে পারে। নিতান্ত গরীবের জন্য ব্লাড ব্যাংকের রক্ত অ্যাডজাসটমেনটের ভিত্তিতে পাওয়া গেলেও মধ্যবিত্তদের ওই দাম ছাড়া রক্ত পাবার কোন উপায় নেই। এমারজেন্সি মেডিকেল ওয়ারডে এ কারণে একটি রাবার স্ট্যামপই করা হয়েছে। রোগী এলে সেটি তার টিকিটে মেরে দেওয়া হয়। তাতে লেখা: 'দুঃখিত, রক্ত নেই। অন্য হাসপাতাল দেখুন।'

বিভিন্ন বিভাগের প্রধান

ডাঃ অমৃতরঞ্জন বড়ুয়া—কেমিসট্রি ও বায়োকেমিসট্রি
ডাঃ কমলকুমার ব্যানার্জি—অ্যানাটমি
ডাঃ সুজিতকুমার চৌধুরী—ফিজিওলজি
ডাঃ এস কে বিশ্বাস—প্যাথোলজি
ডাঃ মধুসূদন দে—ফার্মাকোলজি
ডাঃ জে বি মুখার্জি—ফোরেনজিক
ডাঃ আর এন রায়—মেডিসিন
ডাঃ বি রায়চৌধুরী নিউরোলজি
ডাঃ সি আর মাইতি—হারট
ডাঃ পি কে মুখার্জি—সারজারি
ডাঃ আবীরলাল মুখার্জি—ই এন টি
ডাঃ এস কে সামন্ত—অর্থোপেডিক
ডাঃ আই এস রায়—অপথালমোলজি
ডাঃ ডি কে বাগচি—পেডরিয়াটিকস
ডাঃ সি এস দাঁ—অবসট্রেটিকস ও গাইনোকোলজি

ছাত্র-ছাত্রী

আনডার গ্রাজুয়েট ছাত্র সংখ্যা	১,১২১
ছাত্রী	১৮১
প্রথম বর্ষে আসন সংখ্যা	১৫৭
পোসট গ্রাজুয়েট ডিপলোমা ছাত্র	৪৫
পি জি ডিগ্রির ছাত্র	৩

ডাক্তার নেই, নারস নেই

শুধু কি যন্ত্রপাতি, খালি কি ওষুধপত্র, মেডিকেল কলেজে ডাক্তার এবং নারসেরও ঘাটতি। বলা হয়ে থাকে—ডাক্তাররা গ্রামে যেতে চান না। কিন্তু কলকাতার হাসপাতালে ডাক্তার-নারস পাওয়া যায় না কেন স্বাস্থ্য দফতর কি তার জবাব দেবেন? একথা কি সত্যি—কয়েক শত ডাক্তার এখনও এই রাজ্যে বেকার? যেখানে প্রতি দশজন রোগী পিছু একজন করে নারস থাকার কথা, সেখানে মেডিকেল কলেজে প্রতি পঞ্চাশজনে একজন নারস কেন? অন্তত ৬৯টি নারসের পদ এখনও খালি। হাসপাতালে পুরো সময়ের মেডিকেল অফিসারের সংখ্যা এখন মাত্র ১৪৬ জন। শিক্ষকতার কাজে যে সব ডাক্তাররা আছেন তাদের অনেকেই প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে পারেন। তারা তাদের লেকচার ও প্রাইভেট প্র্যাকটিস নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। দায়সারা ভাবে নির্ধারিত দিনে কিছুক্ষণের জন্য আউটডোরে আসেন। হাসপাতাল চালাবার প্রকৃত ভার এইসব ডবলু বি এইচ এস মেডিকেল অফিসার ও হাউস সারজেনদের হাতে। কিন্তু ইনটারনিদের জন্য হাসপাতালের ভেতর কোন হসটেল নেই। হসটেল নেই নারসদেরও। একে তো প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্টাফ নেই, তদুপরি মঞ্জুরিকৃত স্টাফের মধ্যে বহু পদই খালি। যেমন ৪ জন অ্যানেসথেটিসট, ১ জন এক্স-রে টেকনিসিয়ান, ৩ জন সিনিয়র ও ডি, ৩২ জন পিউপিল নারস, ২১ জন মেডিকেল অফিসার ও ৫০ জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর পদ শূন্য। ৫০ জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগের সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু যখন ইনটারভিউ চলছিল তখন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ইউনিয়ন বিক্ষোভ জানিয়ে ইনটারভিউ বন্ধ করে দেয়।

চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীদের সঙ্গে হাসপাতালের ডাক্তার ও রোগীদের সম্পর্ক ভাল নয়। তারা ভীষণ ভাবে সংগঠিত এবং যে কোন মুহূর্তে হাসপাতালের কাজকর্ম অচল করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। জনসাধারণের অভিযোগ—অতিরিক্ত টাকা না দিলে ওয়ারড-বয়দের সাহায্য পাওয়া যায় না। তারা বলে—লোক কম, তাদের দিয়ে খাটিয়ে মারা হচ্ছে। ডাক্তারবাবুরা বলেনঃ ওদের সব সময় পাওয়া যায় না। কিছু লোক খাটে কিছু লোক খাটে না। সরকার এদের সমীহ করে চলেন এবং শত অপরাধ ক্ষমা করেন। কারণ এরা খেটে খাওয়া শ্রমিক মজদুর এ কারণে পবিত্র। কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ জে বি মুখার্জি ক'দিন আগে কলেজের ১৪৫তম প্রতিষ্ঠা দিবসে হাসপাতাল কর্মচারীদের উদ্দেশে যে কতকগুলি কথা বলেছিলেন তা কারুরই নাকি মনঃপূত হয়নি। ডাক্তার মুখার্জি বলেছিলেনঃ হাসপাতালে ট্রেড-ইউনিয়নের স্থান নেই। এখানে ব্যক্তি স্বার্থের চেয়ে সেবাই বড় আদর্শ হওয়া উচিত। ঠিক সময় মত কাজে আসা, কর্তব্য কর্মে নিষ্ঠা, দায়িত্ব বোধ ও সততা এই প্রতিষ্ঠানে যারা কাজ করছেন তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে এটাই প্রত্যাশা। কিন্তু ডঃ মুখার্জি বোধ হয় মহাকরণের কর্তাদের চেয়ে একটু বেশি প্রত্যাশাই করে বসেছেন। কারণ ওখানকার কর্তারা এবং তাদের চালিত 'ভালো মানুষ' স্বাস্থ্যমন্ত্রী বছরে তিন কোটি টাকা করে মেডিকেল কলেজকে দিয়েই খালাশ। হিসাবপত্র নেবার মত মানসিকতা সদিচ্ছা ও শক্তি কিছুই তাদের নেই। ★



রোগীদের পায়েক- ধোপাদের জামাকাপড়

আলোকচিত্র: দীপক ভাট্টচার্য

গর্ভবতী নারীর-মূত্র বন্ধ্যাত্ব ঘোচাতে পারে

মৌসুমী বন্দ্যোপাধ্যায়

দুর্ঘটনায় আহত কিংবা অসুস্থ দুর্বল মানুষ। রক্ত দেওয়া দরকার, তার নিজস্ব গ্রুপের রক্ত। মানুষকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে মানুষ। সুস্থ সবল কোন দাতার রক্তে প্রাণ ফিরে পান অসুস্থ মানুষ। রক্তদান, বিশেষ করে স্বেচ্ছায় রক্তদান তাই জীবনদানেরই অন্য নাম।

অবাক হবেন না, রক্তদানের মতোই মূত্র দানও ক্ষেত্রবিশেষ একটি পবিত্র কর্ম। মূত্রও করতে পারে মানুষের কল্যাণ। গর্ভবতী নারীর মূত্র থেকে তৈরি ওষুধ হাসি ফোটাতে পারে অনেক মানুষের মুখে। এই ওষুধ চিকিৎসা বিজ্ঞানের নতুন দিক খুলে দিয়েছে। না, শুধু বিদেশে নয়, আমাদের দেশে, খোদ কলকাতায়ও কাজ চলেছে। প্রতিদিন কলকাতা ও আশেপাশের বেশ কিছু সংখ্যক গর্ভবতী নারী ওষুধ তৈরির জন্যে দান করছেন তাদের মূত্র।

ভারতে এই উদ্দেশ্যে একটি প্রকল্প গৃহীত হয়েছে যার কাজ গর্ভবতী নারীর মূত্র থেকে হিউম্যান কোরিউনিক গোনাডোট্রফিন (এইচ সি জি) নামে একটি আমিষ উত্তেজক বা প্রোটিন হরমোন পদার্থ নিষ্কাশিত করে নিয়ে তা দিয়ে ওষুধ তৈরি করা। এই ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা হবে বন্ধ্যা নারীর বন্ধ্যাত্ব মোচনের বা তাদের মাসিক ঋতুস্রাবের গণ্ডগোল দূর করার। পুরুষের অনুর্বরতা দূর করার ক্ষেত্রেও এই ওষুধ হতে পারে ফলপ্রসূ। যেসব নারীর মাসিকচক্র অনিয়মিত, যাদের ডিম্বোস্ফোটনের অভাবে গর্ভ সঞ্চার হয় না অথবা যে সব পুরুষের বীর্যে সুস্থ জীবন্ত শুক্রকীটের অভাব তারাও উপকার পেতে পারেন এই ওষুধ সেবনে।

সংক্ষেপে এইচ সি জি নামে এই প্রোটিন হরমোন বা জৈব উত্তেজকের কাজ হচ্ছে সন্তানসম্ভবা নারীর গর্ভস্থ ভ্রূণকে সযত্নে রক্ষা করা ও তাকে স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠতে সাহায্য করা। এই হরমোন শরীরের রক্ত স্রোতে মিশে থাকে এবং তার অপ্রয়োজনীয় বাড়তি অংশ প্রস্রাবে মিশে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়।

যৌন-মিলনের পর নারীর জরায়ুতে পুং-শুক্রকীট নিষিক্ত ডিম্বে মিলিত হবার পর আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে তার মূত্র পরীক্ষা করলে ধরা পড়ে এই হরমোনের অস্তিত্ব। কোন নারী প্রকৃতই অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে, না অন্য কারণে তার মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ হয়েছে তা নির্ধারণ করবার এই টাই আজকাল অভ্রান্ত উপায়।

গর্ভবতী নারীর শরীর থেকে এই হরমোন প্রস্রাবের মাধ্যমে নির্গত হয়, যতোদিন তিনি গর্ভধারণ করেন ততোদিনই। তবে গর্ভের প্রথম চারমাস এই হরমোন উৎপাদনের হার সর্বাধিক।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলকাতা শহর ও উত্তর চব্বিশ পরগণার কোন কোন এলাকার হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিকে নির্দেশ দিয়েছেন ব্যক্তিগত মালিকানায় এই ওষুধ তৈরির প্রকল্প সফল করে তুলতে যথাসাধ্য সাহায্য ও সহযোগিতা দান করে।

প্রতিদিন বেলেঘাটা, মানিকতলা, রাজা বাজার, পাইকপাড়া, কাশীপুর, বরানগর, বারাসত, মধ্যমগ্রাম, ব্যারাকপুর, নিউ ব্যারাকপুর ও বিরাটি এলাকা থেকে প্রায়

আটশো লিটার পরিমাণ মূত্র সংগৃহীত হচ্ছে এই উদ্দেশ্যে।

এই প্রকল্প রূপায়ণে নানা রকম বাধা বিপত্তি অসুবিধার কথা উল্লেখ করে প্রকল্পের এক বিজ্ঞানী বললেন, এমন অনেক পরিবার আছে যারা এ ধরনের প্রস্তাব কানে শুনেই আঁতকে ওঠেন। ওদের মধ্যে অনেকের ধারণা মূত্রদান করলে নাকি গর্ভস্থ ভ্রূণের ক্ষতি হতে পারে। বলা বাহুল্য এই ধারণা একেবারেই ভিত্তিহীন।

এ ছাড়াও আছেন এমন অজস্র ব্যক্তি যাদের মনে আছে এক ধরনের অযথা সংকোচ। গর্ভাবস্থার কথা বেশি আগে থাকতে প্রকাশ করতে এরা একান্ত নারাজ। যখন প্রকাশ করেন তখন অনেক দেরি হয়ে যায়। গর্ভের প্রথম চার মাসের পরে মূত্রে যে পরিমাণ হরমোন পাওয়া যায় তাতে বিশেষ কোন কাজ হয় না। কারণ তা প্রায় নগণ্য।

গরিব ও নিম্ন মধ্যবিত্ত যৌথ পরিবারে রয়েছে এই ধরনের মূত্র সংগ্রহ ও গবেষণাগারে পাঠানোর আগেকার সংরক্ষণ সমস্যা। কারণ যারা মূত্র দেন তাদের বেশির ভাগের বাড়িতেই কোন শৌচাগার নেই।

উপযুক্ত মূত্রদাত্রীদের স্বেচ্ছায় মূত্রদানে উৎসাহিত করতে অর্থ দেওয়া হয় কিনা এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞানী ভদ্রলোক বললেন, স্পেনে এ ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা একবার করা হয়েছিল। কিন্তু তাতে ফল হয়েছিল বিপরীত। কারণ দেখা গেছে অর্থের লোভে অনেকে অসাধুতার আশ্রয় নেয়। মূত্রেও ভেজাল চলে।

এখানে অবশ্য মূত্রদাত্রীদের কিছু কিছু উপহার দেওয়া হয়।

এখন মূত্রদানের ক্ষেত্রে পৃথিবীতে সর্বাগ্রগণ্য দেশ হচ্ছে হল্যান্ড। সেখানকার হাজার হাজার অন্তঃসত্ত্বা নারী নিয়মিত মূত্র সরবরাহ করছেন ওষুধ তৈরির কারখানায় গবেষণাগারগুলোকে, সন্তানহীনা মা বোনদের দুঃখ ঘোচাতে।

অবশ্য এই প্রসঙ্গে একটা সুখবর এই যে নানা রকম বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও আমাদের দেশেও কাজ থেমে নেই। 'মায়ের জন্য মা' এই আওয়াজ খুব কাজে দিয়েছে প্রকল্পের। এখন বহু পরিবার অবশেষে উপলব্ধি করতে পেরেছেন, যে যদি 'মানুষের ফেলে দেওয়া দরকারি 'নোংরা' জিনিসে সাধিত হয় অপরের পরম উপকার – বন্ধ্যানারীর সন্তান লাভ— তবে কেন তা কাজে লাগাবো না? ★

ভারতেও মেয়েদের সুন্নত করা হয়

মারুফ উল হক

মুসলমান সমাজে খাতনা বা সুন্নত একটি অবশ্যপালনীয় ধর্মীয় রীতি। পুরুষদের খাতনার প্রথা চলে আসছে স্মরণাতীত কাল থেকে। খৃস্ট ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও এই খাতনা বা সারকামসিসানের প্রথা প্রচলিত। সাধারণভাবে এই প্রথাটি পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রচলিত থাকলেও মেয়েদের খাতনার কথা অনেকেরই জানা নেই। খুব চলিত না হলেও মেয়েদের খাতনার রীতি কিন্তু অপ্রচলিত নয়।

মেয়েদের মধ্যে খাতনার প্রচলন প্রথম দেখতে পাওয়া যায় আফরিকার আদিবাসীদের মধ্যে। পরবর্তীকালে মুসলিম, ইহুদি ও খৃস্ট ধর্মাবলম্বীরাও এই প্রথাকে মেনে নেয়। সুদান, সোমালিয়া, মিশর, কেনিয়া, এবং আরো কয়েকটি আফরিকান দেশে। ভারতেও এক বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত। ভারতে মেয়েদের খাতনা দিয়ে থাকে ইসলাম ধর্মাবলম্বী একটি শ্রেণী।

মেয়েদের খাতনা দেওয়ার তিনটি পদ্ধতি প্রচলিত আছে। প্রথমটি অতি সাধারণ যাতে ক্লিটোরিসের সম্মুখভাগ কেটে বাদ দেওয়া হয়। দ্বিতীয়টিতে পুরোপুরি ক্লিটোরিস এবং লাবিয়া মাইনোরা কেটে দেওয়া হয়। শেষেরটি আরও সাংঘাতিক। এতে সম্পূর্ণ ক্লিটোরিস, লাবিয়া মাইনোরা, লাবিয়া মেজোরা কেটে এবং এক স্তর চেঁছে দেওয়া হয়।

খাতনার সময় মেয়েদের পা দুটি বেঁধে রাখা হয় যতদিন না ক্ষত সম্পূর্ণ সারে। এটি সম্পন্ন করা হয় ঘরেই। কোন ওষুধপত্র ব্যবহার বা জীবাণুনাশক কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। কোন শল্য চিকিৎসক খাতনায় হাত লাগান না। এটি করে থাকেন বয়স্ক অশিক্ষিত মহিলা যার দেহের অ্যানাটমি সম্পর্কে কোন জ্ঞানই নেই।

ভারতে যে গোষ্ঠীর মধ্যে মেয়েদের খাতনার প্রথা প্রচলিত আছে তাদের সমাজেরই নির্দিষ্ট 'দাই' এই কাজটি করে থাকে। এদের মধ্যে এই প্রথাটি বাধ্যতামূলক। মেয়ের বয়স পাঁচ বছর হলেই এটি সম্পন্ন করা হয়। এরা বাইরের সমাজে মেয়েদের খাতনার কথা জানায়নি। সারকামসিসানের প্রথম পদ্ধতিটি এরা মেনে থাকে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে ছুরি, ধারাল খোলস, পাথর প্রভৃতির সাহায্যে এই কাজটি করা হয়।

মেয়েদের খাতনার পরিপ্রেক্ষিতে বিদেশে বিভিন্ন গবেষণায় অনেক অসুখ বিসুখ ও অসুবিধার কথা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু ভারতের এই গোষ্ঠীর মধ্যে কোন অসুবিধা পরিলক্ষিত হয় কিনা তা অবশ্য জানা যায়নি। কারণ এই সমাজের উপর বিশেষ গবেষণামূলক কাজ হয়নি, নজর পড়েনি সমাজ বিজ্ঞানী বা নৃবিজ্ঞানীদের। এই বিশেষ জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার আলো পড়েছে, সভ্যতার ছোঁয়াচ লেগেছে– তবুও এখানে মেয়েদের খাতনা প্রচলিত আছে।

মেয়েদের 'খাতনার' উপর সর্বপ্রথম আলোকপাত করেন ফ্রাঙ্ক হোসকেন। ভারতের বুকে এর প্রচলনের নজির কেউ তুলে ধরেননি। কিন্তু প্রচলন আছে ভারতের মাটিতে 'বোরা' গোষ্ঠির মধ্যে। এদের মূল বাসস্থান আদিতে ছিল বহির্ভারতে। ভারতে এদের প্রধান আবাসস্থল হল সুরাট। এদের বেশি দেখতে পাওয়া যায় গুজরাট ও রাজস্থানের বিভিন্ন স্থানে। এ ছাড়া ভারতের প্রায় প্রতিটি শহরে এদের দেখা পাওয়া যেতে পারে। হয়ত ভারতে আরও কোন জাতি, জনজাতির মধ্যে এই প্রথা গোপনভাবে চলে আসছে।

সুদানে ১৯৬৭ সালে ৪,০২৪ জনের উপর সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে ৩,৮২০ জন এই প্রথার শিকার হয়েছে। কেনিয়াতেও এগার থেকে পনের বছরের স্কুল বালিকাদের মধ্যে গবেষণায় একই ধরনের তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৭২ সালে নাইরোবির সাতটি সেকেনডারি স্কুল এবং 'এম্ব' জেলার দুটি স্কুলে সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে প্রথাটি প্রচলনের হার কমলেও এখনও বিদ্যমান।

কেনিয়াতে মেয়েদের খাতনার প্রথাকে নতুন করে চালু করা হয়েছে যাতে চিরাচরিত রীতি রেওয়াজ বজায় থাকে। দেখা গেছে এম ডি ডিগ্রী-প্রাপ্ত চিকিৎসাবিদও নিজের মেয়ের খাতনা করিয়েছেন। কৃষ্টিগত প্রথাকে ছোঁয়া উচিত নয় বলে রাষ্ট্রসংঘও সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেছেন।

কিন্তু কেন এই প্রথার প্রচলন? খাতনার স্বপক্ষে প্রধান বক্তব্য হলঃ খাতনা বয়স আসার অনুষ্ঠান; এতে যৌন উত্তেজনা থেকে শিশু কন্যাদের রক্ষা করা সম্ভব। এই বক্তব্যের দোহাই দিয়ে লক্ষ লক্ষ শিশুর দেহ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। আর এই প্রথা মানসিক দৈহিক যৌন স্বাস্থ্যের দিক থেকে ভয়ানক ক্ষতিকারক।

ধর্মে হাত দেওয়া উচিত নয়। ধর্মে যদি না বাধে তাহলে এই প্রথাকে বিলোপের পথে টেনে নিয়ে গেলেই বোধহয় ভাল হবে। ★

বিশ্ব-বিচিত্রা

কাজীর বিচার

ইতালির যে কোন সমুদ্রসৈকতে



গেলে মনে হবে এদেশে পোশাকের ব্যবহার আজও শেখেনি মানুষ। নগ্ন হয়ে সূর্যস্নানের হিড়িক পড়ে গেছে সেখানে। নারী পুরুষ লাজ-লজ্জার বালাই নেই কারো।

দক্ষিণ ইতালির কালাব্রিয়া সমুদ্রতট থেকে একদল নগ্ন নারী পুরুষ চালান হলেন আদালতে। বিচারক মহিলাদের ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, ছি ছি পুরুষের না হয় লজ্জা থাকতে নেই, তা বলে আপনারাও কি ওদের মতো...

উত্তর ইতালিতে কাজীর বিচার উলটো। জেনোয়া শহরে ধমক দেওয়া হলো পুরুষদের—মেয়েরা প্রকৃতির এক সুন্দর সৃষ্টি, কিন্তু আপনাদের আছেটা কি ?

বুড়ো মেরে

৮৫ বছরের বুড়ো র‍্যালফ জারমানোকে পিটিয়ে মেরে ফেলে কুমারী ইভ পসটেলের জেল হল ৯৯ বছর। ঠিক একই সঙ্গে ছিনতাই-এর অপরাধে তার জেল হল ওই ৯৯ বছরই। ডাকাতির জন্যে জেল হল তার ১৫ বছর। মোট মিলিয়ে তার শ্রীঘর বাসের মেয়াদ দাঁড়াল ১১৪ বছর। সংগী ৪ জনের মধ্যে দুজনের যথাক্রমে জেল হয়েছে ২৫ বছর ও ৩০ বছর। বাকী দুজন বেকসুর খালাস।

ভূ-প্রদক্ষিণ

মিঃ স্প্রিংবেট ৪৪ ঘণ্টা ৬ মিনিটে নির্দিষ্ট আকাশ-পথে ভূ-প্রদক্ষিণ করে বিশ্ব রেকরড ভেঙেছেন। এর আগের রেকরড ছিল ৫৩ ঘণ্টা ৩৪ মিনিট। করেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার তিনজন সাংবাদিক। ১৯৭৮ সালে। অবশ্য ১৯৫৭ সালের তিনজন বোমারু-দলের ৪৫ ঘণ্টা ১৯ মিনিটের রেকরডটিও তিনি ভেঙে দিয়েছেন। শ্রীস্প্রিংবেট লনডনের বীমা বিভাগের একজন পদস্থ কর্মী।

মানুষ-খেকো গিরগিটি

পৃথিবীর বৃহত্তম মানুষ-খেকো গিরগিটটা এখনো বেঁচে। নিউগিনির দক্ষিণের একটা জলাভূমিতে। প্রকাণ্ড দাঁত এবং খাবার এই গিরগিটটা, নাকি ১৮ ফুট লম্বা। বলেছেন অভিযাত্রী জন ব্ল্যাসফোরড-সেল। তিনি ব্রিটিশ সেনাদলের একজন পদস্থ ব্যক্তি। ওর সহযাত্রীরা গিরগিটিটার ছবিও তুলেছেন এবং ওরা এখনো ওখানে তাকে লক্ষ্য রাখছেন। স্থানীয় লোকদের মতে, ওটা একটা মানুষ-খেকো দানব। অভিযাত্রীরা ওখানে এমন একটা সাপের সন্ধান পেয়েছেন, যার চোখই নেই। আর গায়ে তার আঁশের বদলে রঙের দাগ।

সাপ পালালে তর্ক বাড়ে

অজগরের নাম সুন্দরী। ডিসেম্বরের প্রথমে উদয়পুর চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ নজর করলেন সুন্দরী একদম হাওয়া হয়ে গেছে। আর সেই নজর করার পরই শুরু হয়ে গেল নানা তর্কবিতর্ক। রাজস্থানের বনবিভাগ বলেই বসল, সুন্দরী নির্ঘাৎ কুড়ি ফুট পাঁচিল ডিঙিয়ে পালিয়েছে। চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের অবশ্য মত অন্যরকম। তারা বললেন, এমনিতেই জঙ্গল থেকে যখন ঐ সাপটা ধরা পড়েছিল তখন তার দুটো দাঁত ছিল ভাঙা। দাঁত দিয়ে জাল না কাটলে সে পালাল কি করে ?

রাজস্থানের খবর কাগজগুলোতে হৈ চৈ পড়ে গেল। টনক নড়ল রাজ্য সরকারেরও। এমন কি স্থানীয় যুব জনতা দল অন্দোলন শুরু করল।

পালিয়ে গেল কোথায় এই সর্প সুন্দরী ? চিফ ওয়াইলড লাইফ ওয়ারডেন কৈলাস শাংখালা বলছেন,

রাজ্যে রাজ্যে

বেচারা বোধহয় মারাই গেছে।

মারা গেল কি করে ? আর কেই বা মারল তাকে ?

চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের মতে, কুড়ি ফুট উঁচু ঐ জালের পাঁচিল বাইরে থেকে কেউ কেটে দিয়েছিল। যাতে সুন্দরী অনায়াসে বাইরে বেরিয়ে আসে। আর বেরিয়ে এলেই চোরাশিকারীর দল তার চামড়া মোটা দামে বাইরে পাচার করবে। হয়তো সে চামড়া এতদিনে পাচার হয়েও গেছে।

বনবিভাগ জন্তু জানোয়ার সম্পর্কে যতটা খবর রাখে তাতে তাদের অন্তত বলা উচিত হয়নি যে, একটা অজগর অমন উঁচু পাঁচিল কামড়ে ছিঁড়ে পালাতে পারে। বিখ্যাত প্রকৃতিবিদ রাজা তেজসিং এবং বীরেন্দ্র সিং চৌধুরী বিতর্কে যোগ দিয়ে বলেছেন, এ ঘটনা ঘটতেই পারে না। তাদের মতে, জঙ্গলের কোন দুরন্ত অজগরও অমন কাজ করে না।

তাছাড়া খাঁচার মধ্যে এত ভারী একটা শরীরের টানাহেঁচড়া বা ছটফটানিরও কোন চিহ্ন পাওয়া যায়নি। সুন্দরীর সঙ্গে ঐ একই খাঁচায় ছিল আরও দুটো অজগর। প্রকৃতিবিদদের মতে, একজন বেমালুম খাঁচা ছিঁড়ে পালাল আর বাকিরা তাকে অনুসরণই করল না, এ হতে পারে না।

বনবিভাগ এবং চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ দুতরফেই স্থানীয় পত্রিকাগুলির বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলল যে, ওরা সমাজবিরোধীদের উসকানিতে মিথ্যে খবর ছাপছে। তার ওপর বনবিভাগের গেম ওয়ারডেন জয় সমন্দ বলেই বসলেন, জঙ্গলের মধ্যেই সুন্দরীকে পাওয়া গেছে, দু-এক দিনের মধ্যেই তাকে আবার চিড়িয়াখানায় ফিরিয়ে আনা হবে। কিন্তু সে 'দু-একদিন' এখনও শেষ হয়নি। আর একজন বললেন অন্য কথা, সুন্দরীকে নাকি অন্য একটা জঙ্গলে বুঁদ হয়ে শুয়ে থাকতে দেখা গেছে।

আসলে রাজস্থানে রাধাকৃষ্ণের প্রভাবটা একটু বেশি। রাধা যেমন সর্বত্র কৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করতেন এখন রাজস্থানে ছোটবড় সব অফিসারই সেই প্রেমলীলায় ভুগছেন। যেখানে যে অজগর দেখছেন তাকেই সুন্দরী বলে ভুল করছেন।

এই চিড়িয়াখানায় গত কয়েক মাসে বেশ কিছু জন্তু জানোয়ার মারা গেছে। তার মধ্যে একটা শ্লথ ভাল্লুক চারটে শিংওলা অ্যানটিলোপ, কয়েকটি গন্ধগোকুল, আর বেশ কিছু শজারু আছে। গত তিন মাসে এতগুলো প্রাণী মারা গেল কিন্তু কোন অটোপসি করা হল না। কেন ?

মহিষাদল থানার অন্তর্গত নন্দকুমার বাজারের কাছে খেজুরবেড়্যা গ্রামে কয়েক বছর আগে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য ঘরবাড়ি তৈরি হয়েছিল। কয়েক মাস আগে এর নির্মাণ কার্য প্রায় শেষ হয়েছে। এমনকি আট/ন মাস আগে থেকে একটি ফলকও দেখা যাচ্ছে 'খেজুরবেড়্যা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ১৯৭৯।' স্থানীয় জনসাধারণ ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না। অথচ এখান থেকে মহকুমা হাসপাতালের দূরত্ব দশ কিলোমিটারের বেশি। অধিকন্তু নন্দকুমার বাজার এলাকার এবং স্থানীয় গ্রামবাসীরা দিনের পর দিন কষ্ট ভোগ করে চলেছেন।

(মেদিনীপুর সংবাদ/মেদিনীপুর)

জোড়াবেল প্রাইমারী স্কুলের ছেলেদের টিফিনের পাউরুটিতে একটা লম্বা বিছে ভাজা অবস্থায় পাওয়া যায়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিষয়টি পুলিশের নজরে আনেন।

(শিখরভূমি/পুরুলিয়া)

বি ডি আর স্টেশনের পিছনে, সেকেনড ফিডার রোড এলাকায় পানীয় জলের তীষণ অভাব। এই এলাকায় একটি টিউবওয়েল বসানো হলে অনেকটা সুরাহা হবে। পৌরসভাকে উদ্যোগী হবার অনুরোধ জানাচ্ছি।

(হিন্দুবাণী/বাঁকুড়া)

মাথাভারী প্রশাসনযুক্ত সীমান্ত রক্ষী বাহিনী 'অতন্দ্র প্রহরীর' ন্যায় নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও ইদানিংকালে উত্তরবঙ্গ বাংলাদেশ সীমান্ত দুইদেশের চোরাচালানীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে।

জেলায় জেলায়

এই সীমান্তর বিভিন্ন চোরাপথে (সাহেবগঞ্জ, চৌধুরী হাট, দেওয়ানগঞ্জ, ফুলবাড়ি গোয়াল গঞ্জ, হিলি) বিদেশী কোট, প্যানট, মহিলা ও শিশুদের জামা, ঔষধ, গুঁড়োদুধ, চটের বস্তা, তামাক আসছে। আর এপার থেকে কনট্রোলের কাপড় ধুতি শাড়ি যাচ্ছে। (হিমাচল বার্তা/শিলিগুড়ি)

আমেদপুর রেল স্টেশন চত্বরে এক সাধুবাবা বহুদিন ধরে আশ্রম করে নাম সংকীর্তন করতেন। সেই সাধুবাবার মৃত্যুর পর তার কাছে তিন হাজার টাকা নগদ পাওয়া যায়। পাশের এক ফলওয়ালার কাছে সাধুবাবার আটাশ হাজার টাকা গচ্ছিত ছিল। সে টাকা সাধুবাবার স্মৃতির উদ্দেশ্যে খরচ হবে।

(পল্লীশ্রী/বোলপুর)



ছবি এঁকেছেন : জি সাহা

অমানবিক

খোলাডাঙার আব্দুল মান্নান বিয়ে করেছেন সম্প্রতি। কিন্তু অর্থাভাবে দাওয়াত জানাতে পারেননি গ্রামের সকলকে। এতে ক্ষুব্ধ হয়েছে গ্রামের যুবকেরা। তারা তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করলেন অভিনবভাবে—

মান্নানের বৌভাতের দিন গ্রামের এক কুকুরের সঙ্গে পাশের গ্রাম সুজলপুরের এক কুকুরীর বিয়ে দেওয়া হল বাজনা বাজিয়ে মহাসমারোহে। কুকুরের মালিক লুৎফর রহমানের বাড়িতে সারাদিন মাইক বাজলো। বৌভাতও হল মহা ধুমধামে। গ্রামের লোককে দাওয়াত জানিয়ে খাসির গোস্ত রুটি খাওয়ানো হয়! (দৈনিক ইত্তেফাক)

চৌর্যবৃত্তি

দেশের সাহিত্য চলচ্চিত্র গান সর্বক্ষেত্রেই হালে চুরির প্রবণতা বেড়ে চলেছে। এর বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদে মুখর দেশের সচেতন অংশ এমনকি টি ভিও। অথচ—

অথচ টি ভি কর্তৃপক্ষও অত্যন্ত সচেতনভাবে এই চৌর্যবৃত্তি চালিয়ে যাচ্ছেন। ভারতের আনন্দশঙ্করকে অনুষ্ঠানের সূচনা থেকে নাটকের আবহে প্রতিটি অনুষ্ঠানে এতো বেশি ব্যবহার করা হচ্ছে যে তাকে টি ভি-র স্টাফ আরটিসট বলে ভুল হয়! এছাড়া পাকিস্তানের মোসলেউদ্দিন কিংবা গ্রীসের মিকিস-এর সুরসৃষ্টি হরহামেশাই ব্যবহৃত। বিজ্ঞাপনের বেলায় তো পুরোটাই বিদেশী সুরের নকল!

(চিত্রালী)

পীরিতের রীতি

ষোড়শী সালেহা মন দিল গণি মোল্লাকে। জানাজানি হতেই বাড়ির লোকজন আপত্তির ঝড় তুললেন, এ বিয়ে হবে না। আপত্তির কারণও সঙ্গত। গণি মোল্লা যে ইতিপূর্বেই এককুড়ি বার বিয়ে করেছেন।

কিন্তু সালেহা সে ঝড়ের মুখেও অচল। সে হুমকী দিল আত্মহত্যার। এই হুমকীতেই কাজ হল, ৯২ বছরের গণি মোল্লার একুশতম স্ত্রী হয়ে ষোড়শী সালেহা ঘর ছাড়ল। (দৈনিক বাংলা)

পরিবহণের অভাবে

ফেচুগঞ্জ সার কারখানার উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছোঁয়াতে এক নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে। পরিবহণের সমস্যা।

পরিবহণের অভাবে প্রায় ৭ কোটি টাকার সার খোলা আকাশের নিচে পড়ে আছে। এর মধ্যে ইউরিয়া আছে ২২ হাজার টন এবং সাড়ে ৩ হাজার টন অ্যামোনিয়াম সালফেট।

১৯৭৯ সালের গোড়ার দিকে পুনর্বাসন প্রকল্প বাস্তবায়নের পর ফেচুগঞ্জ কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। দিনে ৩৪০ টন ইউরিয়া এবং ৪০ টন অ্যামোনিয়াম সালফেট উৎপাদন হচ্ছে। (দৈনিক বাংলা)



ওপার বাংলার সুনাম

পরমাণু প্রকল্প

দীর্ঘ ১৮ বছর অনিশ্চিত অবস্থায় পড়ে থাকার পর পাবনা জেলার রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্পে কাজ আবার শুরু হচ্ছে।

১৯৬২ সালে ৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষম একটি পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরির প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল রূপপুরে। ১৯৬৯ সালে তা বাড়িয়ে ২০০ মেগাওয়াট করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

কিন্তু সে সব সিদ্ধান্তই কাগুজে—কাজ হয়নি কিছুই। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এর বাস্তবায়নের পরিকল্পনা নিয়েছেন। প্রাথমিক পর্বে ১২৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্রের জন্যে ৭৮০ বিঘা জমিও বরাদ্দ করা হয়েছে। আনুমানিক খরচ ধরা হয়েছে সাড়ে চারশ' কোটি টাকা।

(দৈনিক বাংলা)

বল্মীকি

বালাবাড়ির সারকেল অফিসের আলমারি আর টেবিলের ওপর উইয়ে কাটা কাগজের স্তূপ! হাতের ছোঁয়া লাগলেই ঝুরঝুর করে কাগজের গুঁড়ো ঝরে পড়ে—এ সবই দরকারি সরকারী দলিলপত্র। অবহেলা আর সংরক্ষণের অভাবেই এই করুণ অবস্থা।

সরকারী দলিল দস্তাবেজের এই অবস্থার সুযোগে জমির জবরদখল নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা-দাঙ্গা বাধারও আশংকা দেখা দিয়েছে। (দৈনিক ইত্তেফাক)

ওপার বাংলা

শিক্ষার মান

শিক্ষার মান ক্রমশ নেমে যাচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক লেনদেন একান্তই অব্যবস্থিত, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের মাধুর্যে ভাটার টান এসেছে—বিশ্ববিদ্যালয় তদন্ত কমিশন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে তাদের ২৮০ পাতার প্রতিবেদনে এই মন্তব্য করেছেন।

কমিশনের মতে ১২ বছরে ১২ কোটি টাকা উন্নয়নমূলক কাজের জন্যে ইতিমধ্যেই খরচ করা হলেও শতকরা মাত্র ২০ ভাগ শিক্ষক ও ৩০ ভাগ ছাত্র এতে উপকৃত হয়েছেন।

(বাংলাদেশ টাইমস)

একুশে পদক

১৯৮০-র একুশে ফেব্রুয়ারি পদক ঘোষিত হয়েছে। স্বর্ণপদকের সঙ্গে প্রাপ্তকরা পাবেন পাঁচ হাজার টাকার সাম্মানিকও। এঁরা হচ্ছেন: সাহিত্যের জন্য আবুল হোসেন, সঙ্গীতে রেজাবউদ্দিন আহমদ ও আবদুল জব্বার, চিত্রশিল্পে হামিদুর রহমান ও মুর্তজা বশীর, নাটকে রণেন কুশারী, সাংবাদিকতায় মাজদুর রহমানখাঁ এবং শিক্ষা চিন্তায় ফেরদৌস খান।

(দৈনিক সংবাদ)

শিকার

জাহাজমারার চরে চখা শিকারে গিয়েছিলেন জনাব মাজেদুল হক—নোয়াখালি জেলার পরিবার পরিকল্পনা দপ্তরের কর্মকর্তা।

চরে পৌঁছেই পাখি দেখে বন্দুক তাক করে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যান—না, পাখি শিকার আর করা হল না। তার আগেই মৃত্যুর থাবা এগিয়ে এল নিঃশব্দে। বন্দুক হাতে নিয়েই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। রহস্যময় এ মৃত্যুর কারণ জানা যায়নি।

(দৈনিক বাংলা)



ত্রিপুরার বাঙালীরা কি আবার উদ্বাস্তু হতে চলেছেন ?

সব্যসাচী কলমচি

১৯৭৭ সালে বিধানসভার নির্বাচনে ত্রিপুরায় বামফ্রনটের প্রধান নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল ঃ স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ গঠনের মাধ্যমে রাজ্যের উপজাতি জনগোষ্ঠীর হাতে তাদের সার্বিক কল্যাণের দায়দায়িত্ব তুলে দেওয়া।

বিধানসভার নির্বাচনে জয়লাভের পর বামফ্রনট সরকার সেই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালনে তৎপর হয়েছেন। রাজ্য বিধানসভায় স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ বিল এসেছে, গৃহীত হয়েছে, এমনকি রাষ্ট্রপতির অনুমোদনও পেয়েছে।

কিন্তু স্বশাসিত জেলা পরিষদ বিল নিয়ে বিভিন্ন পর্বে রাজ্য রাজনীতির জল ঘোলা হয়েছে বার বার। বামফ্রনট-বিরোধী রাজনৈতিক জোট বাঙালী স্বার্থের পরিপন্থী বলে প্রথম থেকেই এই বিলের বিরোধিতা করে এসেছেন।

বিল, আইন হয়েছে এবং সেই আইন অনুযায়ী আগামী মে মাসে স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ত্রিপুরায়। কিন্তু কি আছে এই আইনে? এই আইন কি ত্রিপুরার বাঙালী জনগোষ্ঠীকে নতুন করে বাস্তুচ্যুত করবে? বিরোধীদের এই আশংকা কতখানি যুক্তিযুক্ত এই আইনের বিভিন্ন ধারার আলোকে তার আলোচনা করা যেতে পারে।

ত্রিপুরার উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলো নিয়ে সেই এলাকার সব ধরনের মানুষের স্বার্থে উন্নয়নমূলক কাজকে একটি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের হাতে অর্পণ করার উদ্দেশ্যেই মূলত স্বশাসিত জেলা পরিষদ আইন রচিত হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের সপ্তম তপশীলে রাজ্য তালিকাভুক্ত ২নং তালিকার পঞ্চম এনট্রির শর্ত অবলম্বনেই এই বিল পাশ করা হয়েছিল। রাজ্যের শাসন ও পুনর্গঠনের কাজে জাতি-উপজাতি সকল স্তরের মানুষের আরও বেশি সংখ্যায় অংশ নেওয়ার জন্যই বর্তমান সরকার পঞ্চায়েত মারফত গ্রামের মানুষের হাতে তুলে দিয়েছেন প্রচুর ক্ষমতা। শহরে শহরে তৈরি হয়েছে নোটিফায়েড এরিয়া কমিটি। আর একই ভাবে উপজাতি অধ্যুষিত স্থানগুলোয় বসবাসকারী জনগণের সার্বিক উন্নয়নের জন্য রচিত হয়েছে স্বশাসিত জেলা পরিষদ আইন।

টিপরা, রিয়াং, চাকমা, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া, লুসাই, হালাম, কুকী, মগ উপজাতিরা ছিল এ রাজ্যের আদি বাসিন্দা। ভারত ভাগ হওয়ার পর তৎকালীন পূর্ববাংলা থেকে লক্ষ লক্ষ হিন্দু বাঙালী উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিলেন এ রাজ্যে। রাজ্যের উপজাতিরা তাদের বাধা দেয়নি—দিয়েছিল আশ্রয়। কিন্তু সেই উদ্বাস্তু স্রোতের ধাক্কায় রাজ্যের এক কালের সংখ্যাগুরু আদিবাসীরা পরিণত হলো সংখ্যালঘুতে। তারা বর্তমানে ছড়িয়ে রয়েছে রাজ্যের বিশেষ কয়েকটি অঞ্চলে। এইভাবে রাজ্যের শাসন ব্যবস্থায় উপজাতিরা হয়ে পড়লেন নগণ্য। তাদের কৃষ্টি সভ্যতা সংস্কৃতি হয়ে পড়ল বিপন্ন। তাদের নিজস্ব কৃষ্টি সভ্যতার বিকাশকে অব্যাহত রাখার জন্য উঠল স্বশাসিত জেলা গঠনের আন্দোলন। কংগ্রেস কমিউনিসট সব দলই নীতিগতভাবে একথা স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে, পাহাড়ী আদিবাসীদের রক্ষার জন্য একটা রক্ষাকবচের প্রয়োজন। কংগ্রেসীরা বিভিন্ন নির্বাচনের আগে পাহাড়ীদের রক্ষাকবচ হিসাবে স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠনের প্রকাশ্য প্রতিশ্রুতি

দিয়েছিলেন। কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি।

বর্তমান সরকার তাদের দেয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী স্বশাসিত জেলা পরিষদ বিল পাশ করে এবং পরে তা রাষ্ট্রপতির অনুমোদনও লাভ করে। এই বিল পাশ করার আগে পর্যন্ত উপজাতি যুব সমিতি নামক উগ্র জাতীয়তাবাদী দলটি বারবার প্রচার করেছে যে 'বাঙালীর দল' সি পি এম কোনদিনই এ বিল বিধানসভায় পাশ করবে না। স্বশাসিত জেলা পরিষদ বিল পাশ এবং বর্তমানে জেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রয়োজনের কথা ঘোষণা তাদের প্রচারকে অমূলক প্রমাণিত করেছে।

জেলা পরিষদের ব্যাপারে বামফ্রন্ট সরকারের বিরোধী দলগুলোর প্রচার ও সে প্রচারের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে দু একটি কথা আলোচনা করা যাক।

স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ বিরোধীদের একটা প্রধান বক্তব্য হলো,—ত্রিপুরার তিন-চতুর্থাংশ অঞ্চল নিয়ে স্ব-শাসিত জেলা গঠিত হচ্ছে, মাত্র এক-চতুর্থাংশ পাহাড়ী উপজাতির জন্য। অন্যদিকে, তিন-চতুর্থাংশ লোককে (যাদের অধিকাংশই বাঙালী) সীমাবদ্ধ থাকতে হবে রাজ্যের এক-চতুর্থাংশ এলাকায়।

আপাতদৃষ্টিতে এই প্রশ্নটা বেশ মোক্ষম বলে মনে হয়, সন্দেহ নেই, কিন্তু ত্রিপুরার মানচিত্রের দিকে তাকালে আসল বিষয়টা বুঝতে অসুবিধে হয় না। রাজ্যের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ এলাকা জুড়ে রয়েছে পাহাড় আর জঙ্গল। সেই সব দুর্গম পাহাড়ে জঙ্গলে বিশেষ বিশেষ স্থানে বাস করে দশ-বিশ ঘর উপজাতি। একটা পাহাড়ী এলাকা থেকে আর একটা পাহাড়ী এলাকার দূরত্ব তিন চার মাইল—এভাবে তারা বিছিন্ন হয়ে বসবাস করেন। জুম চাষের প্রয়োজনে একটা পাহাড়ে আস্তানা গাড়েন আবার ফসল উঠলে চলে যান অন্য কোথাও। তাই উপজাতিদের জন্য যে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ গঠিত হতে চলেছে তার আয়তনও স্বাভাবিক কারণেই বিস্তৃত হয়ে পড়েছে।

শুধু জনসংখ্যার ভিত্তিতে আয়তন স্থির করলে দেখা যায় যে সাড়ে চার লক্ষের কিছু বেশি উপজাতির জন্য যে এলাকা পাওয়া যাবে সেই এলাকার ভেতরে পঞ্চাশ হাজার উপজাতিরও স্থান হবে না। সেক্ষেত্রে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য। আর এ সব কথা চিন্তা করেই বামফ্রন্ট সরকার জেলা পরিষদের আয়তন বাড়াতে বাধ্য হয়েছেন। এই আয়তন বৃদ্ধি সত্ত্বেও লক্ষাধিক উপজাতি জেলা পরিষদের বাইরে থেকে যাবেন। তাছাড়া জেলা পরিষদের নির্ধারিত আয়তনের মধ্যে রিজার্ভ ফরেস্টও রয়েছে—যার উপর এই পরিষদের কোন এক্তিয়ার নেই। তাই স্ব-শাসিত জেলার মোট আয়তন থেকে রিজারভ ফরেসটের আয়তন বাদ দিলে যা থাকবে তা মোট উপ-জাতির জনসংখ্যার আনুপাতিক হারের চেয়ে খুব বেশি হবে না।

বামফ্রনট-বিরোধী নেতাদের দ্বিতীয় অভিযোগ—স্ব-শাসিত জেলা গঠিত হলে এই জেলার সঙ্গে বাইরের ত্রিপুরার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। ধর্মনগর, কৈলাসহর, কমলপুর, খোয়াই, অমরপুর, সাব্রুম প্রভৃতি অঞ্চলগুলি রাজধানী আগরতলার সঙ্গে যোগাযোগবিহীন হয়ে পড়বে। গ্রামগঞ্জের সাধারণ মানুষকে এ কথাটাও বারবার শোনাচ্ছেন তারা।

কিন্তু স্বায়ত্বশাসন মানে কি দেশ বিভাগ? নয়া হিন্দুস্তান-প্যাকিস্তানের সৃষ্টি? একটু সচেতন মানুষ বলবেন: 'না, তা তো নয়!' কোন শহরের পৌর এলাকায় ঢুকতে অথবা কোন গাঁওসভা এলাকায় ঢুকতে কি পাসপোর্ট-ভিসা লাগে? ঠিক সেভাবে স্বশাসিত জেলায় যাতায়াত বা বসতি স্থাপনের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোন বিধিনিষেধই থাকবে না। সুতরাং এ অভিযোগটাও যে কল্পনাপ্রসূত তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

তৃতীয়ত অভিযোগ,—স্ব-শাসিত জেলার সমস্ত জমির মালিক হবেন উপজাতিরা। বাঙালীরা সেখানে জমি কিনতে বা বন্দোবস্ত নিতে পারবেন না—উপজাতি ছাড়া অন্য কারো কাছে জমি বিক্রি করতে পারবেন না। হস্তান্তরিত জমি উপজাতিদের হাতে প্রত্য-র্পণের দৌলতে অনেক বাঙালী পরিবার আবার উদ্বাস্তু হবেন!

কিন্তু স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ আইনে এমন কথা কোথাও নেই যে, এই জেলার সমস্ত মাটির মালিক হবেন উপজাতিরা। আসলে মালিকানা সম্বন্ধীয় যাবতীয় সর্বভারতীয় আইন এবং রাজ্য সরকারের আইন স্ব-শাসিত জেলাতেও বহাল থাকবে। অ-উপজাতি উপজাতি কারোর ক্ষেত্রেই জমি কেনা-বেচার ব্যাপারে নতুন কোন বিধিনিষেধ আলোচ্য আইনে নেই। উপজাতিদের জমি প্রত্যার্পণের ব্যাপারে ভূমি-রাজস্ব এবং ভূমি সংস্কার আইন সমগ্র ত্রিপুরার মত স্ব-শাসিত জেলায়ও প্রযোজ্য হবে।

চতুর্থ অভিযোগ, স্ব-শাসিত জেলায় প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম বাংলা ভাষা হবে না। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হল, এই স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ ইচ্ছে করলে 'কক বরক' ভাষায় প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু করতে পারে। তার মানে এই নয় যে উক্ত এলাকায় কোন বাংলা প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকবে না। শিক্ষা বিভাগটাই তো রাজ্য সরকারের অধীনে রয়েছে।

পঞ্চম অভিযোগ, স্ব-শাসিত জেলায় অ-উপজাতি বাঙালীরা হয়ে পড়বেন দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক।

ভারতের সংবিধানে অনগ্রসর জাতি-উপজাতিদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা প্রথম থেকেই রয়েছে। তার মানে কি এই যে, বাকিরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক? জেলা পরিষদ আইন উপজাতিদের স্বার্থরক্ষার জন্য একটা রক্ষাকবচ মাত্র। এতে অ-উপজাতিদের স্বার্থহানির কোন ব্যবস্থা নেই।

কেউ কেউ একথাও বলছেন যে, অ-উপ-জাতিরা জেলা পরিষদ এলাকায় ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারবেন না। এটাও ঠিক নয়। আইনে বলা হয়েছে (৩৫/২ ঘ ধারায়) যে, স্ব-শাসিত এলাকায় ব্যবসা করতে গেলে অ-উপজাতি এবং জেলার বাইরের উপজাতিদেরও লাইসেনস লাগবে।

এক নজরে ত্রিপুরা

- আয়তন: ১০৪৭৭ বর্গ কিলোমিটার
- লোকসংখ্যা: প্রায় ১৮ লক্ষ
- লোকবসতির হার: প্রতি বর্গ কি মিতে ১৪৯
- গ্রামে বাস করেন: শতকরা ৮০
- শিক্ষিতের হার: শতকরা ৩০

  মোট উপজাতি লোক সংখ্যা: ৪ লক্ষের কিছু বেশি
- বাঙালীদের সংখ্যা: প্রায় ১৪ লক্ষ
- তপশীল সম্প্রদায়ের লোক সংখ্যা: প্রায় ২ লক্ষ
- ত্রিপুরার আদিবাসী: ত্রিপুরী (টিপরা), চাকমা, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া, রিয়াং, লুসাই, হালাম, কুকী মগ ইত্যাদি
- ত্রিপুরীদের মাতৃভাষা: কক বরক (বামফ্রনট সরকার কর্তৃক স্বীকৃত)
- রাজ্যের প্রধান ভাষা: বাংলা
- আদিবাসী রমণীদের পোষাক: রিয়া এবং পাছড়া
- আদিবাসীদের প্রধান উৎসব: কেরপূজা, খারচি পূজা, গড়িয়া পূজা, গঙ্গাপূজা ইত্যাদি



এটা কোন অসংবিধানিক ব্যবস্থা বলে মনে হয় না। অসাধু ব্যবসায়ী ও ফাটকাবাজদের শোষণ ও প্রতারণার হাত থেকে দরিদ্র 'উপ-জাতিদের রক্ষা করার জনাই মূলত এই ব্যবস্থা। ব্যবসায়ীদের জন্য লাইসেনস ব্যবস্থা তো নতুন কোন ব্যবস্থা নয়—অন্যত্রও তা চালু আছে।

সর্বোপরি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ আইন ভালভাবে অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, রাজ্য সরকারের প্রচুর ক্ষমতা রয়েছে এর উপর। জেলা পরিষদের সদস্যরা কোন রকমেই যাতে স্বেচ্ছাচারী হতে না পারেন সে রকম ব্যবস্থাও রয়েছে। রাজ্য সরকার একদিকে যেমন স্ব-শাসিত জেলা পরিষদকে প্রচুর ক্ষমতা দিয়েছেন অন্যদিকে বিচ্ছিন্নতার সম্ভাবনাকে নির্মূল করার জন্য সরকারি নিয়ন্ত্রণের পাকা ব্যবস্থাও করেছেন। জেলা পরিষদ প্রবর্তিত কোন বিধি নিয়মের সঙ্গে যদি রাজ্য সরকারের আইনের সংঘাত হয় তবে সরকারের আইনই বলবৎ হবে। ষষ্ঠ তপশীলের প্রায় সমস্ত ক্ষমতা পরিষদের হাতে দিয়েও রাজ্যের সার্বিক স্বার্থের প্রয়োজনে পরিষদ ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতাও রাজ্যসরকার হাতে রেখেছেন। এর ফলে রাজ্য সরকারের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব এবং বিধানসভা প্রণীত আইনের শাসন আলোচ্য এলাকায় বিরাজ করবে।

স্ব শাসিত জেলা পরিষদ পিছিয়ে পড়া উপজাতিদের স্বার্থরক্ষা করে তাদেরকে যেমন উন্নতির দিকে নিয়ে যাবে, ঠিক তেমনি জেলা পরিষদ এলাকায় বাঙালীরাও তাদের ক্রমোন্নতি বজায় রেখে চলতে পারবেন। এ ভাবেই তৈরি হবে পাহাড়ী-বাঙালীদের গড়া নতুন ত্রিপুরা। ★

এক নজরে জেলা পরিষদের ক্ষমতা

● স্ব-শাসিত জেলার অধীনে জেলা পরিষদের নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উপর নিয়ন্ত্রণ ও শাসন করার ক্ষমতা থাকবে ঃ

ক) রিজার্ভ ফরেসট ছাড়া যে কোন জমি বা কৃষিকাজ বা গোচারণ বা আবাসিক কাজের জন্য বা অকৃষিমূলক কাজ বা অন্য যে কোন কাজ যা কোন গ্রামের, এলাকায় বা শহরের বাসিন্দাদের স্বার্থ রক্ষা পায়—এমন জমির বণ্টন, সংগ্রহ অথবা ব্যবহার করতে পারবেন

খ) সংরক্ষিত বন ব্যতীত যে কোন বনের ব্যবস্থাপনা

গ) কৃষির জন্য যে কোন খাল অথবা জলের গতিপথ ব্যবহার করা

ঘ) জুম চাষ এবং এ ধরনের যে কোন চাষের নিয়ন্ত্রণ

ঙ) গ্রাম অথবা শহর কমিটি বা কাউনসিল

চ) গ্রাম এবং শহর পুলিশ, জনস্বাস্থ্যসহ প্রশাসন সংক্রান্ত যে কোন বিষয়

● সংবিধানের শর্তসমূহ বা স্ব-শাসিত জেলায় বলবৎযোগ্য কোন উপবিধি তৈরির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট আইনের সর্তাধীনে জেলা পরিষদ নিম্নলিখিত বিষয়ে কাজ করতে পারবে ঃ

ক) উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার,

খ) বিবাহে জড়িত যে কোন পক্ষ উপজাতি হলে তাদের বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদ

গ) উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের সামাজিক রীতিনীতি

● জেলা পরিষদ জেলার মধ্যে প্রাথমিক স্কুল, ডিসপেনসারী, বাজার, খোঁয়াড়, ফেরী, মাছচাষ, রাস্তা এবং স্থানীয় যানবাহন ও জলপথ প্রতিষ্ঠা এবং ব্যবস্থাপনা করতে পারবে, এবং এ ব্যাপারগুলি নিয়ন্ত্রণের জন্য রাজ্য সরকারের অনুমোদন নিয়ে নিয়ন্ত্রণবিধি তৈরি করতে পারবেন রাজ্য সরকারের অনুমোদন নিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার মাধ্যম স্থির করে দিতে পারবেন।

● দরিদ্র উপজাতিদের প্রধান শত্রু গ্রামের মহাজনরা। তাই মহাজনদের নিয়ন্ত্রণের জন্য জেলা পরিষদকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। মজুতদার ও কালোবাজারীদের দৌরাত্ম্য বন্ধের ক্ষমতাও জেলা পরিষদের রয়েছে।

● জেলা পরিষদের অধীন গ্রাম পরিষদ এলাকার মধ্যে দেওয়ানী মামলা এবং ফৌজদারী মোকদ্দমার জরিমানা আদায় করতে পারবে। গ্রাম পরিষদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জেলা জজের কাছে আবেদন করা যাবে।

● জেলা পরিষদের জন্য একটি জেলা তহবিল থাকবে ও তাতে জেলা থেকে প্রাপ্ত অর্থ জমা পড়বে। এই তহবিলের হিসাব একাউনটেনট জেনারেলের পরামর্শক্রমে রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী রক্ষিত হবে।

২৮ জন সদস্য নিয়ে জেলা পরিষদ গঠিত হবে। সদস্যরা প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হবেন। ২৮টি নির্বাচনী এলাকায় বিভক্ত স্ব-শাসিত জেলার প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকা থেকে একজন মাত্র সদস্য নির্বাচিত হবেন।

বহুজাতিক ওষুধ কোমপানিগুলি ভারতের মানুষকে শুষছে

আপনি কি খাচ্ছেন? জন্ম নিরোধক ট্যাবলেট? হয়তো জানেন—ওটা অরগ্যানন ইনডিয়ার তৈরি। কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই জানেন না, ঐ ট্যাবলেট শরীরের সমূহ ক্ষতি করতে পারে—উন্নত দেশগুলো থেকে রিপোরটে এ খবর জানা গেছে।[১] আমেরিকার বাজারে শতকরা ৪০ থেকে ৬০ ভাগ গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ 'অকেজো' প্রমাণিত হয়েছে। সেখানে বিক্রি বন্ধ, এমন শ'য়ে শ'য়ে ওষুধ অন্যান্য দেশে বিক্রি হচ্ছে। ইউরোপ ও আমেরিকায় নিষিদ্ধ, তীব্র বিষক্রিয়া হতে পারে এমন বেশ কিছু ওষুধ ল্যাটিন, আমেরিকায় বিক্রি হয়েছিল।[২] ধনী দেশগুলো এরকম অনেক অকেজো ও অনেক সময় ক্ষতিকারক ওষুধ অম্লান বদনে বাজারে চালিয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন! মানবাধিকারের ধ্বজাধারী আমেরিকার প্যারক ডেভিস কোমপানি মারকিন সামরিক- মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় দক্ষিণ ভিয়েতনামে ১ কোটিরও বেশি 'ক্লোরামফেনিকল' ক্যাপসুল বিক্রি করেছিল। কেন জানেন? কিছুদিন আগেই ঐ ক্যাপসুলটি আমেরিকায় ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তাই গুদাম খালি করতে হয়েছিল ভিয়েতনামে।[৩]

পৃথিবী জুড়ে এরকম অনেক নাক্কারজনক কাজে লিপ্ত রয়েছে উন্নত দেশগুলোর বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থা। বিশ্বের শোষিত দেশগুলো তাই আজ তাদের কঠোর সমালোচনায় মুখর। এমনকি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং রাষ্ট্রসংঘও এদের তীব্র সমালোচনা করে বলেছে তৃতীয় বিশ্বে এরা এক ধরনের ঔপনিবেশিকতা চালিয়ে যাচ্ছে, যাকে বলা চলে 'ড্রাগ কলোনিয়ালিজম'।

ওষুধের বহুজাতিক সংস্থাগুলোর আপত্তিকর কাজকর্ম সম্পর্কে বেশ কয়েকটি রিপোরট সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। তাতে অনুন্নত দেশগুলোতে এদের শোষণক্রিয়ার একটি পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যাচ্ছে। এদের মধ্যে বৃটিশ মনোপলি কমিশন, সেনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি রিপোরট, UNCTAD এবং রাস্ট্রসংঘের রিপোরটগুলো বিখ্যাত। ভারতে এই নিয়ে 'হাতী কমিটি' বিশদ সমীক্ষা করে সরকারের কাছে সুপারিশ করেন—সব বহুজাতিক সংস্থাকে জাতীয়করণ করা হোক। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে রহস্যজনকভাবে নীরব থাকাই পছন্দ করেছেন।

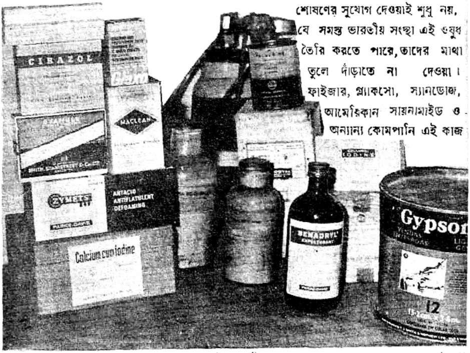
পৃথিবী জুড়ে ওষুধের ব্যবসা করে মাত্র আটটি দেশ—আমেরিকা, বৃটেন, পশ্চিম জারমানি, জাপান, ইতালী, ফ্রানস, হল্যানড

কৌশিক মুখোপাধ্যায়

ও সুইজারল্যানড। কিন্তু বিশ্বের মোট ওষুধ উৎপাদনের শতকরা ৮৫ ভাগ উৎপন্ন করে মাত্র পাঁচটি দেশেঃ আমেরিকা, পশ্চিম জারমানি, বৃটেন, সুইজারল্যানড ও ফ্রানস। বাকি শতকরা ১৫ ভাগ আসে জাপান, ইতালী, হল্যানড ও অন্যান্য অনুন্নত দেশ থেকে। রপ্তানির বাজারেও প্রভু ঐ উন্নত পাঁচটি দেশ—শতকরা ৯০ ভাগই তাদের কব্জায়। ওষুধ নিয়ে গবেষণা ও উন্নতিতে যে বিপুল ব্যয় তাও তারাই করে। ১৯৫০ থেকে ১৯৬৭ সালের মধ্যে যে ১৩৮টি বিভিন্ন ওষুধ বাজারে এসেছে তার মধ্যে ১২৩টিই ঐ পাঁচটি দেশের এক্তিয়ারে।[৪] ভারতের ওষুধের বাজারে মোট বিক্রির শতকরা ৭৫ ভাগ, সৌদি আরবের শতকরা ১০০ ভাগ, নাইজিরিয়ায় ৯৭ ভাগ, বেলজিয়ামে ৯০ ভাগ, কলাম্বিয়ায় ৯০ ভাগ, ভেনেজুয়েলায় ৮৮ ভাগ, ব্রেজিলে ৮৫ ভাগ, মেক্সিকোয় ৮২ ভাগই সেই উন্নত পাঁচটি দেশের বহুজাতিক সংস্থার হাতের মুঠোয়। বুঝতে অসুবিধা নেই, ওষুধশিল্পে একচেটিয়া পুঁজির চরম একাধিপত্য। তাই বহুরকমের স্বেচ্ছাচারিতা করার ক্ষমতা তাদের আছে।

হাতী কমিটির রিপোরটেও দেখা যায়, ভারতেও বিদেশি কোমপানি তাদের সাবসিডেয়ারির মাধ্যমে সরকারের চোখের ওপর সাধারণ মানুষের পকেট কেটে কোটি কোটি টাকা মুনাফা লুটছে। মাত্র কয়েক কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ৫০টি বিদেশি কোমপ্যানির মোট বিক্রির পরিমাণ বর্তমানে ৮০০ কোটি টাকারও বেশি! বাকি ২২০০ ভারতীয় ওষুধ শিল্প প্রতিষ্ঠানের মোট বিক্রি মাত্র ১০০ কোটি টাকা![৫]

বিদেশী কোমপ্যানিগুলো ভারতে মুনাফা করে কতগুলো অপ্রয়োজনীয় ভিটামিন, টনিক ইত্যাদি তৈরি করে, যাতে বিশেষ জটিল কোনো জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। অথচ এসব ওষুধ তৈরি করার সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতি আছে এবং সেগুলির রোগ নিরাময় ক্ষমতাও সমান। তা সত্ত্বেও বহুজাতিক সংস্থাগুলোকে এসব তৈরি করে বিক্রি করতে দেওয়ার অর্থ, তাদের আরো ভালোভাবে শোষণের সুযোগ দেওয়াই শুধু নয়, যে সমস্ত ভারতীয় সংস্থা এই ওষুধ তৈরি করতে পারে, তাদের মাথা তুলে দাঁড়াতে না দেওয়া। ফাইজার, গ্ল্যাকসো, স্যানডোজ, আমেরিকান সায়নামাইড ও অন্যান্য কোমপানি এই কাজ



নিরন্তর করে চলেছে। যেমন, ফাইজার তৈরি করে 'বিকোসুল' ক্যাপসুল। কিন্তু ঐ একই জিনিস ভারতের বেঙ্গল ইমিউনিটি তৈরি করে 'বি আই বি কমপ্লেক্স' নামে। গ্ল্যাকসোর যে ওষুধ 'পিরিটন' বেঙ্গল ইমিউনিটির সেই একই ওষুধ 'বিহিস্টিন'। বারোজ ওয়েলকামের 'বেনোসাইড ফোরট' আর বেঙ্গল ইমিউনিটির 'এয়োফিলের' মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ভারতীয় সংস্থায় তৈরি ওষুধ দামেও অনেক সস্তা। অন্যদিকে বিদেশী কোমপানিতে তৈরি ওষুধের যে দাম ভারতে আদায় হয় তা পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বেশি। আরও আছে। বিশ্বে বাজারে ১৯৬১ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ওষুধের দামের ঝোঁকটা ছিল কমের দিকেই কিন্তু ঐ একই সময়ে ভারতে দাম বেড়েছে শতকরা ৪২ ভাগ! দেশের ক্রেতাসাধারণ শোষিত হচ্ছেন এবং ভারতীয় সংস্থাগুলো

বিশালাকার বিদেশী সংস্থার সঙ্গে প্রাতযোগিতায় না পেরে অবক্ষয়ের পথ ধরছে।

অনেকের ধারণা, ওষুধের ক্ষেত্রে বহুজাতিক সংস্থার ওপর নির্ভর না করে আমাদের উপায় নেই। দুটি বিশ্বযুদ্ধের অন্তবর্তীকালে ভারত যখন ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের আক্রমণে জর্জরিত আর দেশি প্রতিষ্ঠানগুলো তার মোকাবিলায় ব্যস্ত, তখন পশ্চিমী দুনিয়ায় প্রাকৃতিক উৎস থেকে ওষুধ তৈরির সাবেকি পদ্ধতির পরিবর্তে বিভিন্ন ধরনের সূক্ষ্ম রাসায়নিক পদার্থ থেকে ভেষজ তৈরির যুগ এসে গেছে। অতএব, কৃত্রিম ভেষজের আশীর্বাদ থেকে দূরে থাকা আর চলে না; আর তা পাওয়ার জন্যই বিদেশী কোমপানিকেও এ দেশে ব্যবসা করতে দিতেই হল।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, এই বহুজাতিক সংস্থাগুলোর ঐকান্তিক গবেষণার জন্যই সারা বিশ্বের মানুষ বহু নতুন নতুন ওষুধের মুখ দেখেছেন। ভারতের মাটিতেও তাদের ব্যবসা করতে বাধা দেওয়া হচ্ছে না। কোটি কোটি টাকা মুনাফা লুঠছে তারা। কিন্তু আমরা কি পাচ্ছি? 'স্ট্যান্ডিং কমিটি অব দি ন্যাশনাল কনভেনশন অন ইকনমিক ইনডিপেনডেনস অ্যানড পারসপেকটিভ অব ড্রাগ ইনডাসট্রি' সম্প্রতি সরকারের কাছে যে রিপোরট পেশ করেছেন, তাতে দেখা যায়, অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং জীবনদায়ী ভেষজ আয়োডক্লোরোডাইড্রকসি কুইনোলাইন, থয়োসিটাজোন, অ্যাসপিরিন, ডিপথিরিয়া টকসয়েড, টিটেনাস টকসয়েড ইত্যাদি একটি ভেষজও কোন বহুজাতিক সংস্থাই ভারতে ব্যবহারের জন্য তৈরি করে না। মোট চাহিদার শতকরা ৯০ ভাগ টেট্রাসাইক্লিন হাইড্রোক্লোরাইড ও ০.০১ ভাগ অ্যানালজিন আসে বিদেশী কোমপানিগুলো থেকে। অর্থাৎ জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজনীয় কোন ভেষজই বিশ্বখ্যাত বহুজাতিক সংস্থাগুলো তৈরি করে না! সরকার তবুও নীরব।

উন্নত দেশের বহুজাতিক সংস্থাগুলোর প্রচণ্ড এই দাপটের কতগুলো বিশেষ কারণ আছে। ভেষজ শিল্পে এমন কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে, অন্য কোন শিল্পের ক্ষেত্রে যা লক্ষ করা যায় না। এই শিল্পের উৎপাদন ও সম্প্রসারণ তার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিপণন-ব্যবস্থার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। একান্তভাবেই তা ভেষজ শিল্পের নিজস্ব।

উন্নত দেশগুলোর ভেষজ-প্রযুক্তিবিদ্যা গড়ে উঠেছে সেই দেশের সামাজিক প্রয়োজন ও অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে। পুরো ভেষজ প্রযুক্তিবিদ্যাটাই একচেটিয়া পুঁজির অধিকারে। তারা ওষুধ বা ওষুধের নাম করে যা সরবরাহ করবে, আমাদের তাই ব্যবহার করতে হবে। অন্য উপায় নেই। তাছাড়া, 'পেটেনট' নাম ব্যবহার করাটা এ শিল্পে সরকারীভাবে অনুমোদিত। এই 'পেটেনট' ব্যবস্থা থাকার ফলে ১৬ থেকে ২০ বছর তারা একটা ওষুধের ওপর একটানা ব্যবসা করে যেতে পারে। অনুন্নত দেশে যখন বহুজাতিক সংস্থা ব্যবসা ফেঁদে বসে, তখন তাদের স্বেচ্ছাচারিতা সহ্য করতে সরকার অনেক সময় বাধ্য হন এই 'পেটেনট' নামক ব্যবস্থাটির জন্যে। ধরুন, এ দেশে কোন বহুজাতিক সংস্থা বেশি দামে কোন ওষুধ বিক্রি করছে। আন্তর্জাতিক বাজারে হয়ত সেই ওষুধ অনেক সস্তায় পাওয়া যায়। কিন্তু শুধু সরকার কেন, আইনত কেউই সে ওষুধ এদেশে আমদানি করতে পারবে না। আইন অনুযায়ী একমাত্র পেটেনট-প্রাপ্ত সংস্থাই সেই ওষুধটি ব্যবহার করার অধিকারী। ফলে, অনেক সময়ই আইন কাগুজে বাঘে পরিণত হয়।

ওষুধের গবেষণা ও উন্নতিতে বিপুল ব্যয়ের ক্ষেত্রে আমেরিকার স্থান প্রথম—সব মিলিয়ে বছরে সেখানে ব্যয় হয় প্রায় ৫০ কোটি ডলার (৪০০ কোটি টাকা)। অনুন্নত দেশের মাটিতে এই বিরাট অর্থের এক কানাকড়িও তারা ব্যয় করে না। তাই ভেষজ শিল্প ও প্রযুক্তবিদ্যার সঙ্গে গরীব দেশের মানুষের নাড়ীর যোগ গড়ে উঠতে পারে না। তাদের যে কোন মৌলিক গবেষণার আশীর্বাদ থেকে আমরা বঞ্চিত। কোন নতুন ওষুধ আবিষ্কৃত হলে আমাদের দেশে তার উৎপাদন শুরু হয় কমপক্ষে দশ বছর বাদে। মাঝে মাঝে কুড়ি বছরও লেগে যায়। ডেকসোমেথাসোম, বিটামেথাসোম, ট্রিয়ামসিনোলোন, সেফ্যালিন অকস্যাসিলিন, অ্যামপিসিলিন, ফ্রুসিমাইড, প্রেডনিসোলোন, করটিসোন, টেরামাইসিন, ক্লোরামফেনিকল, স্ট্রেপটোমাইসিন, পেনিসিলিন, সালফানিলামাইড ইত্যাদির ক্ষেত্রে তো একথা খুব সত্য। দিনের পর দিন আমরা শুধুই পরনির্ভরশীল হয়ে গেছি। এই অবস্থায় বিদেশী সংস্থাকে এভাবে যথেচ্ছ মুনাফা করতে দেওয়া উচিত কিনা, তা ভেবে দেখা দরকার।

ওষুধ শিল্পসংস্থার একচেটিয়া ক্ষমতা বজায় রাখার আরেকটি হাতিয়ার ওষুধের বিপণন-ব্যবস্থা। ওষুধের বাজার অন্যান্য জিনিসের চেয়ে প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ আলাদা। অসুস্থ হয়ে পড়লে লোকে ওষুধ খেতে বাধ্য হয়, শখ করে নয়। সাধারণত ডাক্তারের নির্দেশ মতো লোকে ওষুধ খেয়ে থাকে। তাই ওষধ সংস্থার কাছে রোগীর চেয়ে ডাক্তার বেশি আপনজন। কারণ ডাক্তারকে একবার হাত করতে পারলেই কোমপানির ওষুধ ভূরি ভূরি প্রেসক্রিপশন হতে থাকবে, আর রোগীরা অটল বিশ্বাসে সেসব কিনবে। এখানেই আসে বিশেষভাবে শিক্ষণপ্রাপ্ত মেডিকেল রিপ্রেসেনটেটিভের ভূমিকা। বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে তারা সুসজ্জিত হয়ে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করে তাদের সংস্থার ওষুধের মৌখিক প্রচার করেন। এবং বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করেন। ওষুধ সংস্থাগুলো, তাদের বিক্রি বাড়াবার জন্য আরও কয়েকটি পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে: কনফারেনস, সুদৃশ্য বিজ্ঞাপন, মেডিকেল জারনাল ইত্যাদি। কাজেই, ওষুধের বাজারে বেশি বা কম দামের ওপর সংস্থাগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা নির্ভর করে না, নির্ভর করে নামী ডাক্তার মারফৎ বাজারে ওষুধ চালিয়ে দেবার ক্ষমতার ওপর।



বিক্রি বাড়াবার এসব অস্ত্র গরীব ভারতীয় সংস্থাগুলোর প্রায় নেই বললেই চলে। তাই ওষুধ তৈরির দক্ষতা থাকলেও বাজারে প্রাতিযোগিতায় তারা বিশালকায় বহুজাতিক সংস্থার সঙ্গে এঁটে ওঠে না।

আগেই বলেছি, ওষুধের 'পেটেনট' নাম ব্যবহার করাটা এদেশে সরকারীভাবে অনুমোদিত। এই সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন সংস্থা বিভিন্ন নামে একই ওষুধ বাজারে বিক্রি করে এবং তাদের রোগ নিরাময় ক্ষমতাও সমান। ফাইজার কোমপানির 'টেটরাসাইক্লিন' এবং হেকসট-এর হসটাসাইক্লিন' একই ওষুধ। রোশ কোমপানির 'ব্যাকট্রিন' ও ডলফিন ল্যাবরেটারিজ-এর 'সালফাপ্রিন'-এর ভেতর ভেষজগত কোনো পার্থক্য নেই। আবার রোশ-এর 'ফেরো-রেডকসন' এবং আমেরিকান সায়নামাইড-এর 'অর্টারিন' একই ওষুধ। রোশ-এর 'বিকজাইম সি ফোর্ট' ও ফাইজারের 'বিকোসুল' ক্যাপসুলের ভেষজগত পার্থক্য নেই। এরকম আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। বক্তব্য এই: একই ভেষজ যদি বিভিন্ন সংস্থা বিভিন্ন

নামে বাজারে চালায়, তবে ব্যবসায়িক মুনাফাটাই তারা করে। আর আমাদের হয় সম্পদের অপচয়।

অনেক সময় দেখা যায়, ওষুধ একই, কিন্তু দামের বিস্তর ফারাক। যেমন, ফাইজার-এর 'টেরামাইসিন' এবং 'টেরামাইসিন এস কে'। প্রথমটির দাম ০.৬১ পয়সা। দ্বিতীয়টিও একই, কিন্তু সামান্য একটু ভিটামিন যোগ করতেই তার দাম হয়ে গেল ০.৭১ পয়সা। সরাভাই-এর 'স্টেক্লিন'-এর দাম ০.৩৮ পয়সা। কিন্তু ভিটামিনযুক্ত ঐ একই ওষুধের দাম ০.৭০ পয়সা। রোশ-এর 'ফেরো-রেডকসন'-এর দাম ০.১৯ পয়সা। ঐ একই ভেষজ আমেরিকান সায়নামাইডের 'অটরিন'-এর দাম ০.৩৫ পয়সা। আবার রোশ-এর 'বিকজাইম সি ফোর্ট' এবং ফাইজারের 'বিকোসুল'-এর মধ্যে দামের তফাৎ ০.১৩ পয়সা। [১৯৭৮ সালের মূল্য-তালিকা অনুযায়ী]

গরীব দেশকে শোষণ করার জন্যে বহুজাতিক সংস্থার হাতে আরেকটি অস্ত্র আছে। পণ্ডিতেরা যাকে বলেন 'ট্রানসফার প্রাইসিং'। ব্যাপারটি একটু খোলসা করে বলা প্রয়োজন। অনুন্নত দেশে ওষুধ তৈরি করে বিক্রির জন্য বহুজাতিক সংস্থাকে বাইরে থেকে বিভিন্ন ধরনের ভেষজ আমদানি করতে হয়। দুটি জায়গা থেকে তারা তা করতে পারে। প্রথম, প্রয়োজনীয় ভেষজটি তারা কোমপানি-হেডকোয়ার্টার থেকে আমদানি করতে পারে। এবং দ্বিতীয় উপায় হলো, আন্তর্জাতিক খোলা বাজার থেকে সরাসরি আমদানি। প্রায় সব ক্ষেত্রেই তারা প্রথম উপায়টি অবলম্বন করে থাকে। এবার এই দুটো উপায়ের ক্ষেত্রে দামের ফারাক লক্ষ করুন। কলম্বিয়ায় একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, হেডকোয়ার্টার থেকে আমদানি করতে গেলে 'টেটরাসাইক্লিন বেস'-এর দাম পড়ে ২৫০ ডলার। খোলা বাজারে এই দাম মাত্র ২৩.৫ ডলার! 'মেট্রোনিডাজল'-এর দাম হেডকোয়ার্টারে ৩৮০ ডলার, কিন্তু খোলা বাজারে ১১.১৫ ডলার। 'মিথাইলডোপ' হেডকোয়ার্টারে ৮০ ডলার, তবে খোলা বাজারে মাত্র ১৮.৪৮ ডলার। বোঝা যাচ্ছে, খোলা বাজারে দামের তুলনায় বহুজাতিক সংস্থাগুলো ডাকাতের মতো কতো বেশি দাম নিয়ে থাকে! এই দাম পেটেনট ওষুধে প্রতিফলিত হয় এবং স্বাভাবিকভাবেই অনেক, অনেক বেশি দামে আমাদের ওষুধ কিনে খেতে হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে খোলা বাজারের দামের তুলনায় হেডকোয়ার্টারের দাম শতকরা ৬,৪৭৪ ভাগ বেশি।[৭] স্বেচ্ছাচারিতা আর কাকে বলে!

বিভিন্ন দেশের ওষুধ শিল্পে এরকম অরাজক একটা অবস্থা যে চলতে দেওয়া যেতে পারে না, এ বিষয়ে প্রতিটি অনুন্নত দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা একমত। তবে বহুজাতিক সংস্থার ক্ষমতা সংকুচিত করার জন্যে যে যে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হচ্ছে, তাতে কোন কাজ হবে বলে মনে হয় না। উন্নত দেশগুলো তাদের নিজের দেশে যে সব ব্যবস্থা নিয়েছে বা নিচ্ছে, অনুন্নত দেশকেও সে-সব ব্যবস্থা নিতে তারা উৎসাহিত করছে। যেমন, আমেরিকার সরকার চেষ্টা করছেন ডাক্তারেরা যাতে প্রেসক্রিপশন করার সময় ভেষজের প্রকারগত নামই (generic name) যেন শুধু উল্লেখ করেন, কোন বিশেষ কোমপানির ওষুধ নয়। বৃটিশ সরকার চেষ্টা করছেন সংস্থার মুনাফার হারকে নিয়ন্ত্রণে আনতে। ফ্রানস সরাসরি ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণে আগ্রহী।

কিন্তু ভারতের মতো গরীব দেশে এই ধরনের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কখনোই কার্যকর হতে পারে না। বহুজাতিক সংস্থার ক্ষমতার দৌড় অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। তারা যে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে শোষণ চালাচ্ছে তার প্রমাণ তার নিজেরাই দিয়েছে। ১৯৭৬ সালে জোট-নিরপেক্ষ দেশগুলোর শীর্ষ সম্মেলনে ওষুধের বহুজাতিক সংস্থার আপত্তিকর কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়। এ বিষয়ে বর্তমানে তিনটি আন্তর্জাতিক সংস্থা, WHO, UNCTAD এবং UNIDO বিচার বিবেচনা করছেন। এই সম্মেলনের কিছুদিন বাদেই ইউরোপের কয়েকটি বহুজাতিক সংস্থা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মাধ্যমে গরীবদেশগুলোকে ২৫টি গুরুত্বপূর্ণ ভেষজ বিনা-মুনাফায় দিতে রাজি হয়েছে।

আমাদের প্রয়োজন সস্তায় উচ্চমানের ওষুধ। বহুজাতিক সংস্থাগুলো যতদিন এ ভাবে ব্যবসা করবে, ততদিন এ-স্বপ্ন সফল হবার নয়। তাই, বর্তমান অবস্থায় ঐ সংস্থাগুলোর পুরোপুরি জাতীয়করণই একমাত্র উপায়। যদিও ভারতের সরকারি সংস্থাগুলো বিভিন্ন কাজকর্মে সুখ্যাতি অর্জন করতে পারেনি, তবুও এক্ষেত্রে জাতীয়করণ ছাড়া অন্য কোন দাওয়াই তো ভাবতে পারছি না। 'হাতী কমিটির' সিদ্ধান্তও ছিল তাই।

জাতীয়করণের কোন ইচ্ছা সরকারের আছে, তা এই মুহূর্তে মনে করার কোন কারণ নেই। তবে এ পথে না গেলেও স্বাধীনতার পর থেকে সরকার বহুজাতিক সংস্থার ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে বেশ কিছু বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছেন। অবশ্য সমস্যার গভীরতার তুলনায় এগুলো প্রাথমিক পদক্ষেপ মাত্র। মহারাষ্ট্রের পিমপ্রিতে 'ইউনিসেফ' এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহায়তায় পেনিসিলিন তৈরির জন্যে গড়ে উঠেছে 'হিন্দুস্থান অ্যানটিবায়োটিকস লিমিটেড।' এছাড়া সোভিয়েত সরকারের সহযোগিতায় চারটি প্রজেকট গড়ে তোলা হয়েছে তা হচ্ছেঃ ১) উত্তর প্রদেশের হৃষিকেশ-এ একটি 'অ্যানটিবায়োটিকস প্ল্যানট' ২) হায়দ্রাবাদের কুকফাতপল্লীতে একটি 'সিনথেটিক ড্রাগ' প্ল্যানট ৩) মাদরাজের কাছে নানদামবাককাম — এ একটি 'সার্জিক্যাল ইনসট্রুমেনট প্ল্যানট' ৪) কেরালায় একটি 'ফোটো কেমিক্যাল প্ল্যানট'। স্বনির্ভরতার পথে এগুলো একেকটি বিরাট পদক্ষেপ। এছাড়াও গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের ভেষজ-শিল্পের পরিপূরক হিসেবে মহারাষ্ট্রের আপতা-খারপাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'হিন্দুস্থান অরগ্যানিক কেমিক্যালস লিমিটেড'। এদিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র উল্লেখযোগ্য নাম 'হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল প্রকল্প'। এখান থেকে তৈরি হবে প্যারা—ইনট্রোবেনজিক অ্যাসিড, অর্থোঅ্যামাইনোফিল, প্যারামিনোফিনল ও অন্যান্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থ। আশা করা যায়, এর ফলে পূর্বভারতের ওষুধ শিল্প-সংস্থাগুলো, যেমন, বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যানড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস, গ্রকোনেট লিমিটেড, বেঙ্গল ইমিউনিটি, ইসট ইনডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল ইত্যাদি সংস্থাগুলো নতুন জীবন পাবে। ★

আলোকচিত্র: রাজীব বসু

নির্দেশিকা

১। 'মালটিন্যাশনালস ইন দি ইনডিয়ান ড্রাগ ইনডাসট্রি', এন আই জোসেফ, 'সোসাল সায়েনটিসট,' মারচ-এপরিল, ১৯৭৯, পৃঃ ৮৭

২। 'মালটিন্যাশনালস অ্যানড দি ফার্মাসিউটিক্যাল ইনডাসট্রি,' এস লাল, 'সোসাল সায়েনটিসট,' মারচ-এপরিল ১৯৭৯, পৃঃ ২৮

৩। ওপরে উদ্ধৃতি এন আই জোসেফ এর প্রবন্ধ, পৃঃ ৮৭

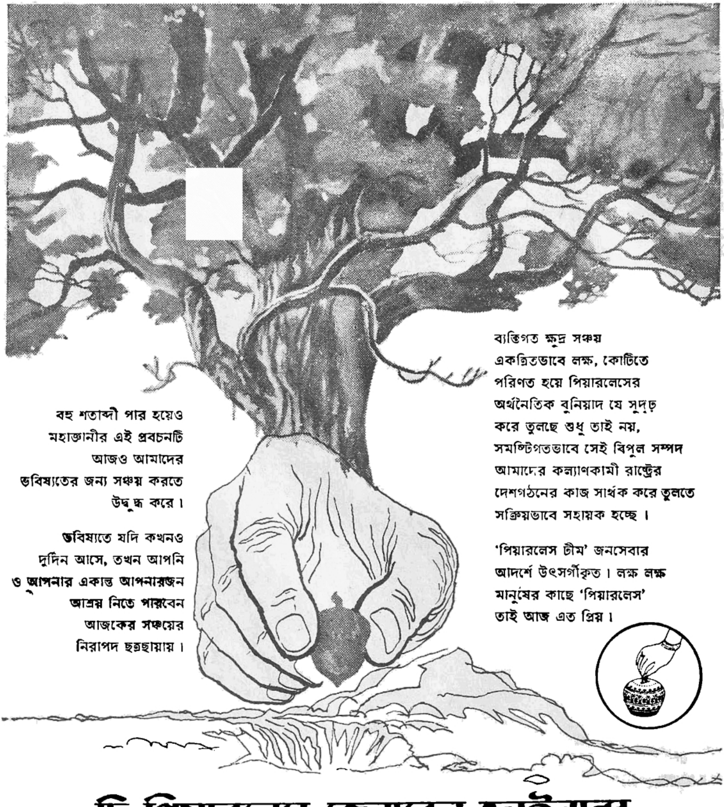
৪। 'স্ট্যানডিং কমিটি অব দি ন্যাশনাল কনভেনশন অন ইকনমিক ইনডিপেনডেনস অ্যানড পারসপেকটিভ অব ড্রাগ ইনডাসট্রি', 'মিথ অ্যানড রিয়্যালিটি অব ড্রাগ ইনডাসট্রি,' নিউ দিল্লি।

৫। ঐ

৬। টম হেলার, 'পুয়োর হেলথ, রিচ প্রফিটস, স্পোকসম্যান বুকস, ১৯৭৭

৭। ঐ

উত্তরপুরুষেরা লাভবান হবে বলেই তিনি বৃক্ষরোপন করেন........ সিসেরো



বহু শতাব্দী পার হয়েও মহাজ্ঞানীর এই প্রবচনটি আজও আমাদের ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করতে উদ্বুদ্ধ করে।

ভবিষ্যতে যদি কখনও দুর্দিন আসে, তখন আপনি ও আপনার একান্ত আপনারজন আশ্রয় নিতে পারবেন আজকের সঞ্চয়ের নিরাপদ ছত্রছায়ায়।

ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র সঞ্চয় একত্রিতভাবে লক্ষ, কোটিতে পরিণত হয়ে পিয়ারলেসের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ যে সুদৃঢ় করে তুলছে শুধু তাই নয়, সমষ্টিগতভাবে সেই বিপুল সম্পদ আমাদের কল্যাণকামী রাষ্ট্রের দেশগঠনের কাজ সার্থক করে তুলতে সক্রিয়ভাবে সহায়ক হচ্ছে।

'পিয়ারলেস টীম' জনসেবার আদর্শে উৎসর্গীকৃত। লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে 'পিয়ারলেস' তাই আজ এত প্রিয়।

দি পিয়ারলেস জেনারেল ফাইনান্স এণ্ড ইনভেষ্টমেন্ট কোং লিঃ

[স্থাপিত ১৯৩২]

রেজিষ্টার্ড অফিস : পিয়ারলেস ভবন, ৩, এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯



ঘরও করি, চাকরিও করি

মীরা সরকার

মহিলা পুলিশের ও সি

সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন ছিল : পুলিশে মেয়েদেরও নেওয়া হবে। উনপঞ্চাশ সাল। মীরা গুহ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এ আর ল পড়েন। আবেদন পাঠাতেই ইনটারভিউয়ের ডাক। এবং সরাসরি সাব-ইনসপেকট্রেসের চাকরি।

কলকাতা পুলিশে মহিলার প্রবেশ সেবারই প্রথম। মোট ন'জন। পরীক্ষায় ফারসট মীরা দেবীই।

সারজেনট দেখলে ভয় পেতেন, পুলিশে এলেন কি করে? মীরা দেবীর মুখেই শুনুন : 'চাকরি সম্পর্কে কোনো আইডিয়াই ছিল না। তাছাড়া নতুনের প্রতি তো একটা আকর্ষণ থাকেই। তবে আসল কথা, সে সময় পারিবারিক কারণে চাকরির প্রয়োজন ছিল।'

চাকরিতে ঢুকে ট্রেনিং। পরে পোসটিং লালবাজারে। নানান অভিজ্ঞতা হয়েছে তার। একবার প্রেমিকা সেজে চৌরঙ্গীর এক সিনেমা হলের নিচে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। সাহসী মহিলা অফিসার হিসাবে নামডাক হলেও সেদিন বুক দুরদুরু করে উঠেছিল।

সালটা ষাট। মীরা দেবী পরীক্ষা দিয়ে একাই ইনসপেকট্রেস হন। তিনিই পশ্চিমবঙ্গ এবং কলকাতা পুলিশের প্রথম মহিলা যিনি এ পদ পান। বর্তমানে লালবাজারে মহিলা শাখার ও সি। অর্থাৎ কলকাতা পুলিশের এক নমবর মহিলা অফিসার। বয়স পঞ্চান্ন।

অফিসের জীবনে তাকে কখনো অপর মহিলার আদেশ শুনতে হয়নি। কিন্তু পুরুষ বসরা কেমন? 'সব ডেপুটি কমিশনাররা দারুণ কোঅপারেটিভ। এদিকে আমি লাকি।'

১৯৬২ সালে মীরা দেবীর পদবী হয় সরকার। স্বামী অর্দ্ধেন্দুবাবু তখন কলকাতা পুলিশের এ্যাসিসটেনট কমিশনার। ঐ ডাকসাইটে অফিসার কি করে আপনজন হলেন? সরকার গিন্নির জবাব : 'লালবাজারেই আলাপ। পছন্দটা নিজেরাই করেছিলাম। বিয়েটা সামাজিক।'

কাকভোরে মীরা দেবীর ঘুম ভাঙে। চা খেয়ে রান্না ঘরে। লোক আছে, তবু নিজেই উনুনে কড়াই চাপান। থোড়, লাউ, মোচার রান্না পছন্দ। আট বছর মাংস, মাছ হেঁসেলে ঢোকে না। দীক্ষা নেবার পর থেকে স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই এসব স্পর্শ করেন না।

পুজোর ঘর…স্নান…খাওয়া। পরপর সব সেরে বেলা দশটার মধ্যেই লালবাজার। উইমেন পুলিশ সেকশন। পাবলিক রিলেশনস ডিপারটমেনটও দেখতে হয়। কী কী কাজ? শ্রীমতী সরকারের সংক্ষিপ্ত হিসাব : এক, কলকাতা শহরে বিভিন্ন প্রয়োজনে মহিলা পুলিশদের পাঠানো। দুই, সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগ শোনা।

সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে চা। ভালো অনুষ্ঠান থাকলে টি ভি'র সামনে বসেন। বই পড়া নিয়মিত অভ্যাস।

স্বামীর ঝোঁক নৃত্যনাট্যে। বিদেশী দল এলে যাবেনই। গিন্নির পছন্দ গানবাজনা। টিকিট কেটে দু'জনে যান।

শ্রীমতী সরকার রাতেও নির্বিঘ্নে ঘুমোতে পারেন না। লালবাজার থেকে কল যায়। উনি বলে দেন কী করতে হবে।

পুলিশের এক্তিয়ারের কাজ শুধু নয়, ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়েও অনেক অদ্ভুত মানুষ মীরা দেবীর কাছে আসেন। এক সুন্দরী যুবতী প্রায় এসে বলেন, কে যেন তাকে খুন করতে চাইছে। এগারো সন্তানের জনক তার বিবাহেচ্ছু চাকুরে মেয়েকে শায়েস্তা করার ফন্দী চান। সন্দেহবাতিক স্বামী, স্ত্রীর নামে অভিযোগ জানান।

'দুঃখ পেলেই মানুষ সহানুভূতি খোঁজে। সব সময় কিছু করতে না পারলেও তাই সবার কথা ধৈর্য ধরে শুনি। সব পুরুষ কি অপরের কথা সর্বদা একঘণ্টা ধরে শুনবেন? মেয়েরা শোনে। তাই সমস্যা সহজে মেটাতে পারে।'

ছাত্রী অবস্থায় মীরা দেবী সরোজিনী নাইডুকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। চাকরিতে ঢুকেও বহু মহিলা ভি আই পি-কে কাছ থেকে দেখেছেন। সবচেয়ে মনে দাগ কাটেন রানী এলিজাবেথ। 'ওই ছোটোখাটো চেহারায় কী দারুণ ব্যক্তিত্ব।' শ্রীমতী সরকারের ধারণা, 'ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধির দীপ্তি না থাকলে সৌন্দর্য ফুটে উঠে না।

মেয়েরা কি সব কাজ পারে? 'কোনো কাজই মেয়েদের কাছে অসুবিধার নয়। ধরুন, ডাক্তার বা নারস হলে রাত জাগতে হবে। তা বাড়িতে মেয়েদের কি অসুখ-বিসুখে একাজ করতে হয় না? তবে শিক্ষকতার মতো পেশা সবচেয়ে ভালো। যাতে ধরা বাঁধা কাজ, সময় নির্দিষ্ট। পুলিশের কাজে কোনো ছুটি নেই। সকলে যখন উৎসবে মাতে তখনও এদের কর্তব্য করতে হয়। এটাই যা অসুবিধা।'

রাজনৈতিক মিছিল সামলাতে মেয়ে পুলিশ লাগে। মহিলা বিক্ষোভকারীরা মাঝেমধ্যে যে ভাষায় কথা বলেন তাতে অন্যের মতো মীরা দেবীও মনে আঘাত পান। ভাবেন, 'কেন এ লাইনে এলাম'? পরক্ষণেই নিজেকে সান্ত্বনা দেন : 'ক্ষোভে ওরা বিবেক-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছেন।'

তিন বছর পর শ্রীমতী সরকারের রিটায়ারমেনট। তিনি নিশ্চিন্তে অবসর কাটাতে চান। কেন? 'পড়া, লেখা, দেশ ঘোরা—কত কাজ বাকি। সুস্থ সবল দেহমন থাকতে থাকতে এসব সারতে হবে যে।'

চাকরির দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় মীরা দেবীর মনে হয়েছে, আজকাল মেয়েদের মধ্যেও অপরাধ-প্রবণতা বাড়ছে। বিশেষ করে চুরি, ছিনতাই, ব্ল্যাকমেলিং। এর কারণ ঘরের বাইরে বেরিয়ে জগৎটা চোখের সামনে দেখে ভোগের আকাঙ্ক্ষা বেড়েছে। তার মতে, অভাব মানুষকে সবসময় চোর করে না। তাহলে সব রিকসাওয়ালা, মুটেওয়ালার জীবিকা অন্য হয়ে যেত।

'তবে মা অফিসে থাকলে ছেলেমেয়ে কিছুটা অবহেলায় পড়ে বইকি। তাদের অবচেতন মনে বাবা-মার প্রতি অভিমান বাড়ে। তাছাড়া অন্যের হাতে শিশুদের রাখলে সে বাবা-মার মানসিক গঠন, শিক্ষা-দীক্ষা পাবে কি করে?'

চাকরি করার জন্য মেয়েদের মাথায় ঘোমটা, সিঁথিতে সিঁদুরের পরিমাণ কমেছে এটা ঠিক নয়। আমি তো সেই আমলেই শাশুড়িকে বলেছিলাম, হাতে লোহা পরে কাজে অসুবিধা হচ্ছে। উনি সেকালের মানুষ। তিনি দেখেছিলেন, স্বামী পরিবারের প্রতি আমার দায়িত্ববোধ আছে কিনা। তাই ওসব সংস্কার পালনে জোর করেননি।'

'চাকরি করতে গেলেই সংসার লাটে উঠবে এমন চিন্তা নিরর্থক। ঘরে থেকেও সংসার উচ্ছন্নে দিয়েছে এমন নজিরের অভাব নেই।' তবে মীরা দেবী তিরিশ বছরের অফিস জীবনে ভালো ভাবেই বুঝেছেন : 'চাকরি অনেক কিছু দেয়, চুরি করে শুধু সময়। সেই সময় যা আর কোনো মূল্যেই ফিরে পাওয়া যাবে না।' ★

সাক্ষাৎকার : বিশ্বজিৎ সিংহ

ঘরোয়া

পরিচালনা
নিকারন চক্রবর্তী

আসরের চিঠিগুলো হরেক মেজাজের ও ভাষার। পড়তে পড়তে অনেক মজার জিনিস চোখে পড়ছে। যিনি বাংলা মিডিয়াম স্কুলের পক্ষে ওকালতি করতে গিয়ে ইংরাজি স্কুলের আদ্যশ্রাদ্ধ করে ছেড়েছেন, তিনিই নির্বিকারভঙ্গীতে 'সতন্ত্র', 'নিসিদ্ধ' ও 'লজ্জাস্কর' লিখে আমাদের লজ্জায় ফেলেছেন। বাংলা স্কুলের সুসন্তানদের বিদ্যার এমনই যদি মহিমা হয় তবে ঘরোয়ার পাতায় হয়ত বানান শিক্ষার আসর বসাতে হবে।

এবারে অনেকগুলো চিঠির নির্বাচিত ও সম্পাদিত অংশ ছাপা হল। উদ্দেশ্য প্রথমত, অনেকের বক্তব্য তুলে ধরা, দ্বিতীয়ত, চিঠির বোঝা হালকা করা। মুদ্রিত চিঠিগুলি যারা লিখেছেন তাদের চিন্তা ও বিশ্লেষণে রয়েছে অভিজ্ঞতার স্পর্শ ও বাস্তবতার দংশন। ভরসা করা যায়, ঘরোয়া আসরে নিজের নাম ছাপার অক্ষরে দেখার জন্য বা পনেরো টাকা সাম্মানিকের লোভে এরা চিঠি পাঠাননি। এরা আসলে চিন্তিত, বিরক্ত অথবা বিপর্যস্ত। এদের পত্রাংশে উদভাসিত মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী ও নতুন পথনির্দেশের জন্য সৌজন্যবশত প্রত্যেককে দশ টাকা করে দেওয়া হবে।

শুধুই মৌখিক প্রতিবাদ ?

শুধু তর্কের জন্য যদি কেউ তর্ক না করেন তাহলে সকলে অবশ্যই স্বীকার করবেন যে, ইংরেজি স্কুল আমাদের পরাধীন করেনি—বর্তমান সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের বাধ্য করেছে ইংরেজি শিক্ষার প্রভুত্বশীল আধিপত্যের কাছে আত্মসমর্পণ করতে। ইংরেজির বিরুদ্ধে মৌখিক প্রতিবাদ যত প্রবল, বাস্তবে পরিস্থিতি ততটা প্রতিকূল নয়। অনেক সময় দেখা যায় যিনি ইংরেজির ঘোরতর বিরোধী, তিনিই আড়ালে ইংরেজির পৃষ্ঠপোষক। এর কারণ কি ? ইংরেজির প্রতি এই দুর্বলতা কেন ? কারণগুলো একটু বিশ্লেষণ করা যাক : ১) সরকারি কাজকর্মে ইংরেজির ব্যবহার এখনও ব্যাপক ২) এক রাজ্যের সঙ্গে অন্য রাজ্যের যোগাযোগ ও ভাবের আদান-প্রদানে এর ভূমিকা অপরিহার্য ৩) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের একমাত্র যোগসূত্র এবং ৪) উচ্চতর শিক্ষায় আগ্রহীদের একমাত্র অবলম্বন এই বিদেশী ভাষা। লজ্জার হলেও স্বীকার করতেই হবে বাংলা ভাষার সাধ যাই হোক, ইংরেজির তুলনায় তার সাধ্য এখনও সীমাবদ্ধ। স্বভাবতই অধিকাংশ অভিভাবকই তাদের ছেলেমেয়েদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় ধর্না দেয় ইংরেজি স্কুলের দরজায়। তার মানে কিন্তু এই নয় যে, তারা সবাই মাতৃভাষার বিরোধী। আসলে সমাজের বিভিন্ন স্তরে ইংরেজির দুরন্ত শাসনের হাত থেকে মুক্ত হওয়া যতক্ষণ সম্ভব না হচ্ছে ততক্ষণ ইংরেজি নির্ভরতা থেকে যাবেই। মাতৃভাষার মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা প্রশস্ত করার প্রয়াস যে শুধুমাত্র কুণ্ঠা ও আলস্যে প্রতিপালিত একটা ক্ষীণ সৌজন্যাচার, বাংলা স্কুলগুলোর দিকে তাকালেই সেটা বোঝা যায়।

অরুণকুমার চক্রবর্তী, কলকাতা ১৭

মিথ্যে দোষারোপ কেন ?

'ইংরেজি স্কুল আমাদের এখনও পরাধীন করে রেখেছে' কথাটিকে পুরোপুরি সমর্থন জানিয়ে বলতে চাই শুধু ইংরেজি স্কুলই নয় আমাদের প্রচলিত শাসনতান্ত্রিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই আমাদের পরাধীন করে রেখেছে। তাই ইংরেজি স্কুলগুলোর বিরুদ্ধে বিষোদগারের আগে মূল সমস্যাগুলোর দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

আমি যতদূর জানি এমন কোনো পরীক্ষা নেই যেখানে ইংরেজি একটি বিষয় থাকে না। রাজ্য সরকারের চাকরির কথা ছেড়ে দিলে আর কোনো সর্বভারতীয় পরীক্ষাতেই বাংলা ভাষার কোনো বিষয় থাকে না। যদিও হিন্দি কোথাও কোথাও থাকে।

রাজ্য সরকারের চাকরির কথাই ধরুন না। বর্তমান সরকার তো স্কুল থেকে ইংরেজি তুলে দেবার মহৎ (?) কাজে ব্রতী হয়েছেন। কিন্তু রাজ্য সরকারের কোন চাকরির পরীক্ষায় ইংরেজি বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হয় না বলুন দেখি ? এমন কি কোনো কোনো পরীক্ষায় (ডবলিউ বি সি এস, মিসলেনিয়াস সার্ভিস) বাংলার একটা পেপার থাকলেও ইংরেজির থাকে দুটো। তারপর দেখুন চাকরির সাক্ষাৎকারে, সেখানেও ইংরেজিতে কথোপকথন। আমাদের রাজ্যের 'লোক সেবা আয়োগ' তো ইংরেজিকেই প্রাধান্য দিতে বেশি উৎসাহী। আজকাল তো শুনছি ব্যাংক-এর করণিক-এর চাকরির সাক্ষাৎকারেও ইংরেজিতে প্রশ্ন করা চলছে। সুতরাং যেসব ছেলেমেয়েরা ইংরেজি স্কুলে পড়ছে তারা নিশ্চয়ই এদিক থেকে বেশ কিছু বাড়তি সুবিধে পাবে।

স্মার্টনেস-এর দিক দিয়েও তারা কিছুটা এগিয়ে গেছে যা কিনা বেসরকারি চাকরির ক্ষেত্রে কিছুটা সহায়ক। ইংরেজি স্কুলগুলোতে যে সব শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা ও আদব-কায়দা শেখানো হয় সেগুলোকেই বেসরকারি নিয়োগ কর্তারা অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন কোনো কোনো বেসরকারি চাকরির বিজ্ঞাপনে তো উল্লেখই করে দেওয়া হয়, 'should have English Medium School background' কাজেই ইংরেজি স্কুলগুলোকে দোষ দেবার আগে এসব দিকগুলো ভেবে দেখা দরকার।

সুকান্ত চৌধুরী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা ৩২

স্বল্পবসনা সুন্দরী মা-দের ভিড়

ইংরেজি স্কুল যে আমাদের পরাধীন করে রেখেছে তাতে কি কোন সন্দেহ আছে ? পরাধীনতা বলতে বাইরের কোন শক্তি বা ব্যক্তির কাছে বশ্যতা নয়। পরাধীনতা নিজের বুদ্ধি, চিন্তা, মর্যাদা ও মানসিকতার কাছে। কোন ভাষা শেখা বা শেখানো নিশ্চয় অপরাধ নয়। কিন্তু ঐ ভাষা শেখাবার এবং ঐ ভাষায় ছোটবেলা থেকে কথা বলা অভ্যেস করাবার চেষ্টাকে পাগলামি বলা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে ? ছেলে তিন-চার বছর হলেই মা-বাবা দৌড়োন পাড়ার ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করাবার জন্য। 'মা' 'বাবা' বলা না শিখুক। 'ড্যাডি' 'মামি', 'থ্যাংক ইউ', 'টা-টা' বলা যেন ভাল করে আয়ত্ত করে। পাড়ার স্কুলে একটু রপ্ত হলেই লাইন মারেন নামকরা স্কুলের দরজায়। যেদিন ফরম দেওয়া হবে তার আগের দিন বাবা বা মা রাত দুপুরে লাইনে দাঁড়িয়ে মশা মারেন। তারপর খোঁজ পড়ে যায় ঐ স্কুলের মত তালিম দিতে পারেন এমন গৃহশিক্ষকের। বয়েস কম বা বেশি। করপোরেশনের অফিসে ধর্না। বাড়ানো বা কমানো সে তো ডাল ভাত। 'সিলভার টনিক' ফেললেই সব হয়ে যায়। মা-বাবার ধারণা নামী স্কুলে না ভর্তি করতে পারলে জাত মান বুঝি সব গেল। এই সমস্ত মা-বাবার ধারণা ইংরেজি স্কুল মানেই সরস্বতীর আ[illegible]র্কা পীঠস্থান। সুতরাং যেনতেনপ্রকারেণ একবার মাথা গলাতে পারলে জাত সাহেবের দ্বিতীয় সংস্করণ না হয়ে পারে না। তারপর কি চাই—চাকরি, সুন্দরী মেয়ে অথবা ভাল চাকরি করা ছেলে—সবই হুড়মুড় করে

এসে যাবে।

নামকরা ইংরেজি স্কুলগুলোর ছুটির সময় গিয়ে দাঁড়ালে বিকৃত মানসিকতার সুন্দর চিত্র পাওয়া যাবে। স্বল্পবসনা সুন্দরী মায়েরা ভিড় করেছেন ছেলেমেয়ে নেবার জন্য। স্কুল ছুটি হবে হয়তো আড়াইটায়। ভিড় দেড়টা থেকে। সব মায়েদের বক্তব্য এক—তার ছেলে বা মেয়ে ফারসট হতে পারতো বা হয়েছে। হতে না পারলে বলেন, জয়েনট ফ্যামিলি তাই…, কিংবা ছেলের পরীক্ষার আগের দিন মিসটারের অফিসে সোশাল ফাংশন ছিলো অথবা বাড়িতে পারটি ছিলো।

প্রাণগোবিন্দ দাশ, কলকাতা ২

ডাক্তারবাবুর মতে

আপনাকেই প্রশ্ন করি—আপনিই বলুন, স্বাধীনতার পর আমাদের দেশের শিক্ষাবিদগণ কি করিয়াছেন। তাহারা শিক্ষার ব্যাপারে সর্বদিক দিয়া চিন্তা করিয়া কি শিক্ষার সুব্যবস্থা করিয়াছেন? আজ আমাদের দেশে শিক্ষার মান কত নিম্নস্তরে নামিয়া গিয়াছে। স্বভাবতই অভিভাবকগণের চিন্তাধারাও বদলাইতেছে। আমার জানা আছে—সন্তানসন্ততিদের সুশিক্ষা দিবার জন্য বহু অভিভাবক তাহাদের সন্তান-সন্ততিদের দিল্লি, বোমবাই প্রভৃতি স্থানে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

আজ ইংরাজি—অফিসে বলুন, ডাক্তারী বা ইনজিনিয়ারিং পড়িতে গেলে—দক্ষ না হইলে চলিবে না। যদিও হিন্দি রাষ্ট্রভাষা, ইংরাজি জানা না থাকিলে পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে বিশেষ কোন দাম থাকে না। বড়ই কষ্টে পড়িতে হয়।

পশ্চিমবঙ্গে প্রতিটি স্কুল কলেজে যদি ঘুরিয়া দেখেন, দেখিবেন—শিক্ষক বা প্রফেসররা ঠিক মতো পড়ান না—আর ছাত্ররাও শিক্ষক বা প্রফেসরগণকে সেইরূপ সম্মান করে না। রাজনীতির দিক দিয়া বিবেচনা করিলে গুরু-শিষ্য এক। কিন্তু শিক্ষার দিক দিয়া যদি দেখেন—দেখিবেন ঠিক তাহার বিপরীত। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, স্যার জগদীশ বোস প্রভৃতি মনীষীগণের উপমা আর খাটে না—তাহাদের সময় শিক্ষা বলিতে শিক্ষাই ছিল—এখন আর তাহা নাই। তাহাদের উপমা দিলে এই মনীষীগণকে অশ্রদ্ধাই করা হয়।

আমার মতে যতদিন না শিক্ষার সর্বস্তরে পরিবর্তন হইতেছে ততদিন অভিভাবকগণ ইংরাজি স্কুলের কথাই ভাবিবেন—আপনি কি ভাবেন?

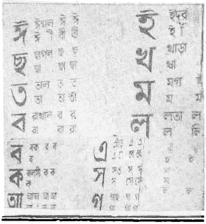
ডাঃ রামচন্দ্র গুপ্ত, হাওড়া

শিক্ষিকার তেতো অভিজ্ঞতা

আমি একটি বাংলা হাইস্কুলের শিক্ষিকা। নার্সারী শেষ করে অনেকেই এই স্কুলে ভর্তি হয়। 'ডিসিপ্লিনের' দিক দিয়ে আমার মেয়েরা কোনো অংশে কম নয়। তাছাড়া দুই স্কুলের ছাত্রীই আমার কাছে পড়ে। তাদের দেখে এই অভিজ্ঞতা হয়েছে বাংলা স্কুলের ছেলেদের কাছে গণিতে, ভূগোলে তাদের হার সবসময়। আমার প্রতিবাদ ইংরাজি স্কুলের বিরুদ্ধে—প্রয়োজনে ভাষা শিক্ষার বিরুদ্ধে নয়। আজকাল ফ্রিজ, টি ভি ইত্যাদি যেমন ফ্যাশনের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে তেমনি ইংরেজি স্কুলে পড়ানোও একটি বিশেষ ফ্যাশন।

একটি বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা শুনুন এক রেসটুরেনটে কিছু 'আলট্রা মডারণ' ছেলেমেয়ে ধোঁয়া ছেড়ে একে অন্যের ঘাড়ে পড়ছিল। দু'জন তরুণী তাদেরই পাশের টেবিলে এসে বসার পরে—প্রথমে দু-এক কলি গান, হাসি, পরে চাপাস্বরে ইংরাজি বুলি, শেষে একটি ছেলে উঠে গিয়ে তাদের কি বলেছিল জানি না। মেয়ে দুটি উঠে যেতে বাধ্য হয়েছিল। এরপরও ছেলের দল তাদের পিছু নেবার ইচ্ছায় ছিল। ভাগ্যক্রমে কিছু বাংলা স্কুলের ছেলেরা এর প্রতিবাদ করায় জেনেছিলাম এরা কলকাতার এক নামী ইংরাজি স্কুলের ছাত্র। এর নাম স্মারটনেস? প্রতিবাদের পরে ইংরাজি স্কুলের ছেলেরা যে বুলি আউড়ে ছিল, তাতে আপনারা শিউরে উঠতেন।

মালা ভট্টাচার্য, শেওড়াফুলী



স্কুল যাদের কাছে গিয়ে পড়ায়

চন্দন মুখোপাধ্যায়



'বাগবাজার ক্যানেল' কেন্দ্রে পরীক্ষা চলছে

অপুষ্ট শরীরে ঝুলে আছে তেলচিটে, ছেঁড়া গেনজি, নিয়াঙ্গে বোতামহীন প্যানট, হাতে পায়ে প্রচুর ময়লা। এমনি কিছু ছেলে-মেয়ে।—অধিকাংশই শৈশবের কোঠায়। এদের দেখা যায় রাস্তায় কাগজ কুড়োতে অথবা শেয়ারের ট্যাক্সি ধরে দেবার জন্যে ছুটোছুটি করতে। কেউবা নিঃশব্দে কাজ করে কোন চায়ের দোকানে। খোলা আকাশের নিচে কিংবা চাটাই অথবা ছেঁড়া চট দিয়ে ঘেরা ছোট্ট ছোট্ট খুপরীতে বসে এমনি কিছু ছেলে-মেয়ে একমনে পড়ে চলে 'চার এক্কে চার, চার দুগুনে আট, তিন চারে বারো…।' কখনো বা শীর্ণ শরীর কাঁপে রক্তচারীর গানে। শ্লেটের উপর কাঁপা হাতে লিখে চলে স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ এক দুই তিন। এই রকম অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে চলেছে চার বছর ধরে আজব নগরী কলকাতায়।'

১৯৭৬ সাল থেকে শুরু হয়েছে ফুটপাথ স্কুল। পরিচালনা করছেন জনশিক্ষা প্রচার কেন্দ্র। আফিস কলেজ স্ট্রীটে। ১৯৬৯ সালে অ্যানথ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অফ ইনডিয়ার অধ্যাপক স্বর্গত নির্মলকুমার বসুর অনুপ্রেরণায় সংগঠিত হয় এই জনশিক্ষা প্রচার কেন্দ্র। গ্রামীণ উন্নতি এবং অন্যান্য কাজের সঙ্গে কেন্দ্রের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও বয়স্ক শিক্ষার প্রচলন। এই প্রচার কেন্দ্র থেকে সাক্ষরতা বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে প্রায় ৬৫টি। ১৯৭৬ সালে লুথারান ওয়ারলড সার্ভিসের সঙ্গে একজোট হয়ে জনশিক্ষা প্রচার কেন্দ্র ফুটপাথে স্কুল তৈরি করে ছেলেমেয়েদের পড়ানো শুরু করেন। ১৯৭৬ সালের মে মাসে শুরু হয় এই প্রকল্প। তখন স্কুলের সংখ্যা ছিল পাঁচ। ১৯৭৯ সালে তা এসে দাঁড়িয়েছে বাইশে। স্কুলগুলি পরিচালনার জন্যে অর্থভার পুরোপুরি বহন করছেন লুথারান ওয়ারলড সারভিস (এল ডবলিউ এস) নামক একটি সেবা প্রতিষ্ঠান। হাওড়া ব্রীজের নিচে দুটি, উলটোডাঙ্গা পূর্ব খালপারে একটি, পশ্চিম খালপারে একটি, উলটোডাঙ্গা রেলব্রীজের কাছে একটি, অরবিন্দ সেতুর নিচে একটি, মানিকতলায় দুটি, শিয়ালদা রেল কোয়ার্টারের পাশে একটি, গোয়াবাগানে স্টেট ব্যাঙ্কের বিপরীতে একটি, টালাপার্কের ভিতরে একটি, বাগবাজারে দুটি, সেনট্রাল এভেনিউ এবং গ্রে স্ট্রীটের সংযোগ-স্থলে একটি, নেবুতলা পার্ক, রামলীলা পার্ক এবং ওয়েলেসলী পার্কে একটি করে তিনটি, নারকেলডাঙ্গা পি এসের বিপরীতে একটি, গিরীশ এভেনিউয়ে একটি এবং মল্লিক বাজারের ফুটপাথে একটি—মোট বাইশটি স্কুল এখন পরিচালনা করছেন জনশিক্ষা প্রচার কেন্দ্র (জে পি কে)।

প্রত্যেকটি স্কুলে দুজন করে শিক্ষক অথবা শিক্ষিকা। অনেকেই কলেজ এবং ইউনি-ভারসিটির ডিগ্রিধারী। সোম থেকে শুক্রবার বেলা দুটো থেকে চারটে পর্যন্ত এরা পড়ান। এদের মাসিক বেতন দেওয়া হয় পঁচাত্তর টাকা। কাজ অনুযায়ী টাকার অঙ্কটা যদিও মোটেই যথেষ্ট নয় তবুও এদের কারুর মুখেই বিরক্তি বা হতাশার ছাপ দেখা যায় না। অরবিন্দ সেতুর নিচে চাটাই দিয়ে ঘেরা অন্ধকার, ছোট্ট স্কুলের ভিতর দাঁড়িয়ে শিক্ষিকা রমা ভট্টাচার্য বললেন : 'পঁচাত্তর টাকায় শুধু-মাত্র যাওয়া-আসা এবং হাত খরচটা হয়; তবুও এই ধরনের কাজে অদ্ভুত মানসিক আনন্দ আছে যা সকলে বুঝতে পারে না।' গোয়াবাগান কেন্দ্রের কুণাল চ্যাটার্জি বললেন, 'সমস্যা অনেক। ফুটপাথের স্কুলে মাঝে মাঝেই যারা ঝামেলা করেন তারা হলেন পুলিশ, মাতাল এবং ষাঁড়। তাছাড়া আত্মীয় স্বজন ভাবেন, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াচ্ছি। চাকুরে বন্ধুবান্ধব টিটকিরি দেয় …সব কষ্ট. সব অভিমান ভুলিয়ে দিয়েছে এরা, এইসব ছেলেমেয়েরা।'

কর্মকর্তাদের একজন—অসীম মুখার্জির—কাছে জানা গেল : এরা লেখাপড়া শিখতে খুবই আগ্রহী। যথেষ্ট বুদ্ধিমান পড়ুয়াও এইসব স্কুলে আছে। অধিকাংশ সময়েই





…রু হবার আগে : 'বাগবাজার' কেন্দ্র

পড়াশোনার বাধা হয়ে দাঁড়ায় এদের পরিবেশ এবং জীবিকা। যেমন—মেদিনীপুর থেকে যারা জীবিকার সন্ধানে কলকাতায় চলে এসেছে, ফসল কাটবার সময় তারা স্বদেশে চলে যান, সঙ্গে নিয়ে যান ছেলেমেয়েদের। ফিরে আসতে আসতে দুমাস, তিনমাস সময় পেরিয়ে যায় এবং ততদিনে ছেলেমেয়েরা ভুলে যায় যা তারা শিখেছিল। তখন কেঁচে গণ্ডুষ করা ছাড়া উপায় থাকে না।

সেনট্রাল এভেনিউ ও গ্রে স্ট্রিটের সংযোগ-স্থলে 'চিলড্রেনস পার্ক' কেন্দ্রের ছাত্রছাত্রীদের মাতৃভাষা হিন্দি। এরা বিহার থেকে আগত। পড়ুয়াদের বয়ঃসীমা তিন থেকে দশ বছর। তারা বাড়িতে বাবা মায়ের সঙ্গে এবং পরস্পর কথা বলে হিন্দিতে, কিন্তু স্কুলে পড়াশোনা করে বাংলায়। ওখানকার শিক্ষক বললেন 'দু তিন মাসের জন্যে দেশে চলে যাওয়ার ব্যাপার না থাকলে এরা খুব তাড়াতাড়িই সব-কিছু শিখে ফেলতো।'

বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের ৬০ শতাংশই রোজ হাজির থাকে। এদের মধ্যে অনেককেই স্কুল শেষ হবার আগেই ছেড়ে দিতে হয় তাদের জীবিকার জন্যে। তবে এদের বাবা মায়েরা এদের লেখাপড়া শিখতে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করে থাকেন।

প্রধানত, দুটি স্টেজে এদের পড়ানো হয়। পড়ানোর ব্যাপারে ঈশ্বরচন্দ্র প্রদর্শিত পদ্ধতিই মেনে চলেন শিক্ষক, শিক্ষিকারা। প্রথম আট মাস বর্ণমালা লেখা এবং পড়া। দ্বিতীয় আট মাস যুক্তাক্ষর শেখা, ছোট ছোট গল্প, কবিতা পড়া এবং মুখস্ত লেখা। যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ শেখা এবং সুর করে নামতা পড়া। এরপর ছেলেমেয়েদের একটি বই দেওয়া হয় 'পড়িতে বসেছি, পড়িব এখন।' বইটি জনশিক্ষা প্রচার কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত এবং এটি ছেলেমেয়েদের অ্যালফাবেট শেখার পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক। প্রতি বছর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে অর্থাৎ ৮ সেপটেমবর ছাত্র-ছাত্রীদের লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হয়। পরীক্ষা শেষে নতুন বই এবং প্রগতিপত্রও দেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ উপলক্ষে গত ২১ নভেমবর দেশবন্ধু পার্কে সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বিশাল অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করেছেন জে পি কে। অনুষ্ঠানে ব্রতচারী, আবৃত্তি, নাটক, নৃত্যাভিনয়—সবকিছুই ছিল যা ছেলে-মেয়েদের নিয়মিত শেখানো হয়। শিয়ালদা কেন্দ্রের ছাত্রছাত্রীদের গণ সঙ্গীত 'উই শ্যাল ওভার কাম,' উলটোডাঙ্গা রেলব্রীজ কেন্দ্রের ছেলেমেয়েদের নেপালী নৃত্য, টালা পার্কের ছাত্রীদের জিপসী নৃত্য অনেক স্বীকৃত মুনসী-য়ানাকেও লজ্জায় ফেলে দেবে।

১৯৭৯ সালে বাইশটি স্কুলের ছেলে-মেয়েদের জন্যে খাতা, পেনসিল, শ্লেট, পড়ানোর জন্য চার্ট, স্কুল তৈরি ও মেরামতের সরঞ্জাম, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শিক্ষকদের বেতন, ফিল্ড কসট, প্রশাসনিক খাতে·· এল ডবলিউ এস ব্যয় করেছেন ১,৬৭ ২০০ টাকা। বাইশটি স্কুলে এখন পড়ুয়ার সংখ্যা ১০৩৬ জন। প্রত্যেক মাসে প্রত্যেক পড়ুয়ার জন্য গড়ে ব্যয় হচ্ছে ১৩ টাকা ৯৩ পয়সা। আগামী বছরগুলিতে এদের জন্যে খাওয়ার ব্যবস্থা করার কথাও ভাবা হচ্ছে।

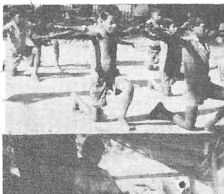
কোন স্কুলে কত ছেলেমেয়ে

স্কুলের নাম	ছাত্র	ছাত্রী	মোট
হাওড়া ব্রীজ	১৯	২১	৪০
বিধান সরণী	—	১৩	১৩
শিয়ালদা(রেলওয়ে কোয়াটারসের কাছে)	২৭	২৫	৫২
উলটোডাঙ্গা ১নং	১৬	২০	৩৬
উলটোডাঙ্গা ২নং	১৫	১৫	৩০
মানিকতলা ১নং	১৭	১০	২৭
মানিকতলা ২নং	১০	৮	১৮
অরবিন্দ সেতু	১৯	১৫	৩৪
উলটোডাঙ্গা ক্যানেল	৫০	৪০	৯০
গোয়াবাগান	২৭	১৪	৪১
পাইক পাড়া (টালা পার্ক)	১৬	২৫	৪১
বাগবাজার ক্যানেল	৫০	৩৫	৮৫
বাগবাজার (টু বি বাসস্ট্যাণ্ডের কাছে)	৫৪	২৬	৮০
চিলড্রেনস পার্ক	২২	২০	৪২
উলটোডাঙ্গা রেল ব্রীজ	৩৪	১৭	৫১
নেবুতলা পার্ক	২৯	২৩	৫২
রামলীলা পার্ক	৩৫	১০	৪৫
মল্লিক বাজার	২২	১৫	৩৭
ওয়েলেসলী পার্ক	১৮	১৭	৩৫
জগন্নাথ ঘাট	১৬	১৯	৩৫
নারকেলডাঙ্গা	৪৯	৫৬	১০৫
গৌরীমাতা উদ্যান	২৮	১৯	৪৭
সব মোট	৫৭৩	৪৬৩	১০৩৬

শীতের সমস্ত রাতটুকু ফুটপাথে, পার্কে, ব্রীজের তলায়, ধুলোমাটির বিছানায় ঘুমিয়ে, জল দেওয়া ভাত, রুটি, ভেলিগুড়, আগের রাতের বাসী তরকারী উদরস্থ করে, সারাদিন-কাগজ কুড়িয়ে, বাবুদের বাড়িতে কিংবা চায়ের দোকানে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করা সত্ত্বেও ওদের চোখের মধ্যে জমে উঠেছে শেখার আগ্রহ। অজানাকে ছুঁতে পারার আনন্দে জ্বলজ্বল করছে ওদের বৈশিষ্ট্যহীন অবয়ব। আলাপ হলো গিরিশ এভেনিউএর 'গৌরীমাতা উদ্যান' কেন্দ্রের ছাত্রী চোদ্দ বছরের কিশোরী তরুবালা মণ্ডলের সঙ্গে। ওরা পাঁচ বছর আগে বিষ্ণুপুর থেকে কলকাতায় চলে এসেছে। বাবা কাজ করে কাঠগোলায়, মা লোকের বাড়ি কাজ করে এবং সেও কাজ করে দু বেলা বাবুদের বাড়িতে। মাইনে পায় ২১ টাকা এবং সকালে পায় দুটো রুটি আর এক কাপ চা। তরুবালা লিখতে, পড়তে, অঙ্ক কষতে খুব ভালো পারে। শুধু যুক্তাক্ষরের বেলায় একটু অসুবিধে হয়। জিগ্যেস করলাম 'লেখাপড়া শিখে কি করবে?' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো 'জানি না।' প্রশ্ন: লেখা-পড়া করছো কেন? উত্তর: ভালো লাগে তাই।

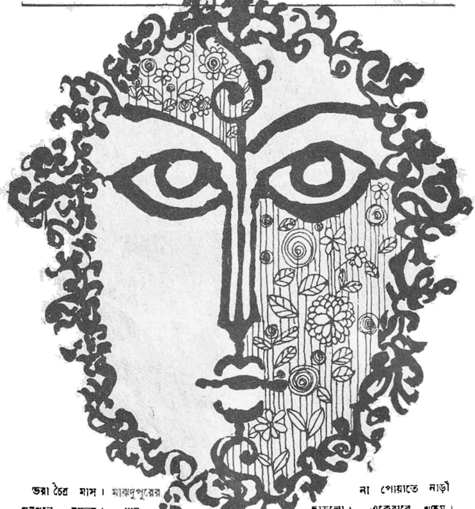
শনি ও রবিবার বাদে যে কোনদিন দুপুরবেলা চলে যান হেদুয়ার পার্কের ভিতর কিংবা উলটোডাঙ্গা খালপারে কিংবা হাওড়ার জগন্নাথ ঘাটে। পায়ে কাটা ঘা থাকলেও ওরা আপনাকে গুজরাটি নাচ দেখাবে, 'মাসটার বাবু' আবৃত্তি করে শোনাবে, শোনাবে 'কি গাব আমি, কি শোনাবো আজি আনন্দ-ধামে।' আপনি দেখবেন কয়েকজন তরুণের অক্লান্ত চেষ্টায় সম্ভব হয়ে উঠছে এক ভীষণ অসম্ভব। ওরা স্কুলে গিয়ে পড়তে চায় না তাই স্কুল ওদের কাছে গিয়ে পড়াচ্ছে। ★


স্কুল চলছে 'উলটোডাঙ্গা ক্যানেল' কেন্দ্রে


শরীর চর্চা করছে 'বাগবাজার' কেন্দ্রের ছাত্ররা


স্কুল চলছে 'নারকেলডাঙ্গা' কেন্দ্রে

'শরীর ফুঁড়ি তেনারই ইচ্ছেতে'



ভরা চৈত্র মাস। মাঝদুপুরের গনগনে রোদ্দুর। ধান শুকোনোর উঠোনে গেরুয়া ধুলোর বুকে চড়ুয়ের দল চান সারে। দূরে তখন ভাঙ্গাতালে ঢাকে কাঠি পড়ছে : পরবের দিন।

বুড়োবটের হাড়গোড় বার করা শেকড়ে গা ডুবিয়ে গামছার হাওয়া খেতে খেতে ফণী চক্কোত্তি বলছিলেন, 'সবই বাবার কৃপা গো। এসব কি আর মানুষে করতে পারে? গাজনের সন্ন্যাসী ভোক্তার শরীরে চেপে তিনিই তো সব করান। মনে ভক্তি রাখলে কিচ্ছুটি হবে না, কিন্তু এদিক সেদিক নজর দিলে, মন থিতু না হলেই গেরো। তেরাত পোয়াতে না পোয়াতে বাঁশের মাচায় চড়ে হরিধ্বনি শুনতে শুনতে চলে যেতে হবে। এক্কেবারে অব্যর্থ। এই দু তিন সন আগের কথা বাপ। এ গাঁয়ের সরদারদের ঘরের এক জোয়ান মদ্দ বাবার গাজনের ভোক্তা হলো। বাপের কাল থেকে এসবের পাট ছিল না ওর। না ছিল কোন মানতটানতও। স্রেফ বাহাদুরী দেখাতে ভোক্তা হয়ে গা গতর ফুঁড়লো গাজনের দিনে. চড়ককাঠে উড়লো। তারপর আর কি. নতুন বচ্ছরের গোড়ার দুচারটে দিন কেটেছে কি কাটেনি, চোখ লাল হলো ছেলেটার। বেহুঁশ ব্যামো। হাতেপায়ে খিঁচুনি। রাত পোয়াতে না পোয়াতে নাড়ী ছাড়লো। এক্কেবারে খতম। বাবাকে অচ্ছেদ্দা করার ফল… '।

ফণী চক্কোত্তি দু চোখ বুজে জোড়হাত কপালে ঠেকালেন। সামনেই গৌরেশ্বরের মন্দির।

সোমনাথ চক্রবর্তী

খড়্গপুর থেকে বেলদা কি কাঁথি যাবার বাসরাস্তার কোল ঘেঁষা গ্রাম দহরপুরের পথে পা বাড়িয়েছিলাম গাজনের দিনগুলোতে। নামডাকওয়ালা কোন জবর মেলার ধুমধাম এ গাঁয়ে নেই। কিন্তু এখনো এ গাঁয়ের মানুষজন শিবের বিয়ের উৎসবে ভোক্তা হয়। নিজেদের শরীরের ওপর অমানুষিক নির্যাতন করে মোক্ষের আশায় মাতে। এ প্রথা শুধু দহরপুরেই নয়, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া এবং বিহারের রুক্ষ পাথুরে মাটির দেশে, গ্রামে-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে আজও।

চৈত্রসংক্রান্তির দিন তিনেক বাকি। গৌরেশ্বরের মন্দিরের সামনের খোলা মাঠটুকুতে ঝাঁপের আয়োজন শেষ। বেলা পড়ে আসে, হাজার মানুষের পায়ের ধুলোয় গোধূলির রঙ। বিলের জলে অবগাহন সেরে ভোক্তারা মাঠ পেরিয়ে আসে। গলায় মোটা-সুতোর উপবীত, পরনে হলুদ ছোপানো কোরা কাপড়। আলের ওপর সানাইওলা পোঁ ধরে, ঢোলে বোল ওঠে।

প্রথমেই কাঁটাঝাঁপ। গাজনতলায় বনবাদাড় খুঁজে আনা সাপের চেরা জিভের মতো বাবলা কাঁটার স্তূপ। 'জয় বাবা গৌরেশ্বর'। চোখ বুজে ভোক্তারা গড়াগড়ি যায় কাঁটার বিছানায়। কান ফাটানো ঢাক বাজে। একবার দুবার বহুবার চিৎ কিংবা উপুড় হয়ে পড়ে থাকলেও কাঁটা গায়ে বেঁধে না। কাঁটাঝাঁপ শেষ হলেই ঢাকে বেজে ওঠে নাচের ছন্দ। ধীরে ধীরে মাতাল হয়ে উঠে মূলভোক্তা। সারা শরীর কাঁপতে থাকে তার। চুলে জট লেগেছে, চোখে ঘোর. শরীরে ছটফটে ভাব, পা টলছে। ধুনোর লকলকে আগুনের লাল রঙ। আওয়াজ 'ঝুঁপা লাগছে, বাবার ভর। জয় বাবা গৌরেশ্বর। শিবো হে…'। দুপাশ থেকে মুশকো জোয়ান কজন আদিবাসী এগিয়ে এলো ঝুঁপা লাগা ব্যাকড়া বা মূলভোক্তাটিকে সামলাতে। কিন্তু ওর শরীরে তখন বুনো মোষের দাপট। অশরীরী শক্তি যে ভর করেছে একথা অবিশ্বাস করার উপায় নেই নিরুপায় মানুষগুলো হাঁক দিলো—আরও ধুনো ধুনো পোড়াও। ধুনোর ধোঁয়া গলগল করে ঘোরলাগা মুখচোখ ঢেকে যায়। মাথা চালার শেষ মুহূর্তে দাঁতে দাঁত লেগে গেছে, ধনুকের ছিলার মতো শরীরের পেশিগুলোও যেন ছিঁড়ে পড়বে। একসময় দুরন্ত শরীর স্থির হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ঢাক গুড়গুড়িয়ে ওঠে চূড়ান্ত গতিতে। অন্ধকারের বুক চিরে কুলকুলি ওঠে 'আ-ব…ব-ব…আ'। জয় গৌরেশ্বর, বাবা ভোলানাথ গো।

ঠিক সেইরাতেই গাঁয়ের আদিবাসীপাড়ার মুণ্ডা, ভূমিজ সরদার ঘরের মরদরা এগিয়ে আসে গাজনের আসরে। মন্দির না ছুঁয়ে দূর থেকে গড় করে জোড়ায় জোড়ায় কষ্টি-





আগুনঝাঁপের প্রস্তুতি



পিঠফোঁড় করাচ্ছে কামার

পাথরে কোঁদা জোয়ানরা। এবার তাদের পালা। মন্দিরের মুখোমুখি মরদরা হাতে হাত ধরে। পুরোহিত ফণী চক্রোত্তি এগিয়ে এসে শুধোন 'দেখিস বাবা, পারবি তো?' 'থামো গ্য' গর্জন করে ওঠে ওরা, ভাঁটার মতো চোখগুলো জ্বলে। 'বাপের নাম নিছি, ফি বচ্ছর শরীল ই ফোঁড় উ ফোঁড় করি, ই 'কড়া' নেওয়া টুক পারবো নাই?' 'তবে চালাও বেত'। চীৎকার করে ওঠে ব্রাহ্মণ। তেল চুকচুকে বেত হাতে নিয়ে তৈরিই ছিলো কজন শক্তসমর্থ যুবক, ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা। সপাং সপাং করে বেত পড়ে আবলুশ কাঠের মতো জোড়া জোড়া কঠিন দু'হাতের কব্জির ওপর। জোরে, আরো জোরে, শরীরের সব শক্তি মিলিয়ে। ওদের শরীর টানটান, চোয়ালের হাড় যেন ফুটে বেরোচ্ছে। একটু চীৎকার, একটু আর্তনাদও নয়। চারদিকের মজা দেখতে আসা কুচো বাচ্চারা কান্না জোড়ে। আদিবাসী মেয়ে-বৌরা আঁচলে চোখ আড়াল করেছে। বেতগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, হাতে একটুকুও কালশিরে পড়েনি, শান্তমুখে গাজনতলায় ধুলো তুলে হাতে ঘসে নিতে থাকে ওরা পরম বিশ্বাসে। একটু জিরোনো, তারপর নিজেরাই হাতে বেত তুলে নেয়। লকলকিয়ে ওঠে বেত, বাতাসে শিসের শব্দ তুলে সারা শরীরময় ছুটোছুটি করতে থাকে তার কঠিন আঘাত। চোখে জল নেই, দেহে রক্তের ছাপ নেই। মনভরা বিশ্বাসের পাত্র কানায় কানায় টলটলিয়ে ওঠে ভরা চৈত্রের খরা দিনে।

এবার 'আগুনে ঝাঁপ'। আঁটি আঁটি খড়, কাঠের গুঁড়ি বেয়ে লকলকিয়ে আগুন ওঠে। দু মানুষ সমান উঁচু কাঠের খুঁটি থেকে হেঁট-মুণ্ডে ভোক্তা ঝুলতে ঝুলতে, দুলতে দুলতে দু হাতের মুঠোভরা ধুনো ছুঁড়ে দেয় আগুনে। দপ করে হলকা এসে লাগে। শিখাগুলো মুহূর্তের জন্য মানুষটাকে গিলে নেয় যেন।

গাজনের ভোক্তা হবার অধিকার আদি-বাসীদের নেই। মন্দিরের বাইরে থেকে মনে মনে ডাক দেয় ওরা—'শিবো হে…'। গাজনের ভোক্তা না হোক, শরীর এফোঁড় ওফোঁড় করে ওরা গাজনে অংশ নেয়, হিন্দু প্রতিবেশীরা যেখানে শুধুই দর্শক। মাসভোর উপোস করে হিন্দু ভোক্তারা। আর আদিবাসীরা শেষ আড়াই দিন মাত্র। সংক্রান্তির দু দিন আগের রাত্রেই ঘরে ঘরে পরদিনের প্রস্তুতি চলে জিভফোঁড় বাণফোঁড় রোজাফোঁড়ের শরীর ফোঁড়াফুঁড়ির। স্বামীর সঙ্গে উপোসী বউও কটাদিন সাত্ত্বিকভাবে থাকে।

সংক্রান্তির আগেরদিনের সকাল হতে না হতেই আদিবাসীপাড়া সরগরম। মেয়েরা সেদিন ফুল কুড়োয়। পরিপাটি করে থালায় সাজিয়ে নেয় বকুল, গুলঞ্চ, কি নাগকেশরের মালা, নতুন কাপড়, হলুদ, তেল, দুর্বো, চন্দনের উপচার। রুদ্দুর মাথায় ওঠে, রাত-ভোর জেগে তৈরি পেল্লায় উঁচু চড়ককাঠ বসানো শেষ, চড়কতলায় ব্যাপারীদের আনা-গোনা, টুকটাক দোকানপাট বসতে শুরু করে। সুতোয় বাঁধা চশমা নাকের ডগায় লাগিয়ে আকাশমুখো তাকায় গাঁয়ের মাতব্বর। 'শুরু করো হে বায়েনরা'। আলসে মেজাজে ঢাকে চোলে কাঠি, সানাইয়ে ফুঁ পড়ে। পুকুর, মাঠ আল পেরিয়ে দলে দঙ্গলে মানুষ পায়ে পায়ে এগোয় লোহাবুড়িয়ার বিলের দিকে। পিছু পিছু ভোক্তা, ব্রাহ্মণ তারপর আদিবাসী রোজা-ফোঁড়ের লোকজন, কামার আর বায়েনরা।

বিলের ধারে ঝাঁকড়া পিপুলের ছায়ায় তখন গায়ে হলুদের পালা। ভোক্তারা একে অপরের শরীর রাঙিয়ে দেয় তেল হলুদে। ফোঁড়ের আদিবাসী ভক্তরাও বাদ যায় না। ওরা সারা গায়ে তেল চুপচুপে হলুদবাটা ঘসে মাখে, বিশেষ করে ফোঁড়বার জায়গাগুলোতে। স্নান সেরে উঠে প্রথমেই আনকোরা কাপড় শরীরে জড়িয়ে নেয় মুণ্ডা কি ভূমিজরা। এ ওর গলায় ফুল কি লাল শোলার মালা পরায় কাছে টেনে কপালে চন্দনের টিপ। চারপাশে রুদ্ধ-শ্বাস পাঁচগাঁয়ের মানুষের ভিড়। এবার আদিবাসীদের ফোঁড়াফুঁড়ির পালা।

প্রথমেই পিঠফোঁড়। সবচেয়ে বয়স্ক মানুষটি এসে দাঁড়ায় কামারের সামনে। কামারের হাতে থাকে 'কালবোদির' কাঁটা—লোহার বাঁকানো ছুঁচোলোমুখো দু দুটো হুকের

মতো প্রতিটির শেষপ্রান্তে শিশলের মোটা দড়ি আটকানো। ছুঁচোলো মুখটিতে একটুকরো লোহার টুপি। পিঠফোঁড় এটা দিয়েই হয়।

বিলের ধারে পশ্চিমমুখে হাতজোড় করে আদিবাসী ভক্তরা সার বেঁধে দাঁড়ায়, পিছনে কামার এসে পিঠের শিড়দাঁড়ার আশেপাশে কোন এক জায়গা জোরে খিমচে ধরে সাঁড়াশীর মতো দুআঙুলে। প্রবীণেরা পাশে এগিয়ে আসে। ঢাক বাজে। এধার ওধার থেকে পঙ্গপালের মতো মানুষ একে অপরের মাথা টপকিয়ে উঁকি দেয়। ফোঁড়ের ভক্তের সামনে



অাগুন ক'াপ

পেছনে তখন তুমুল চীৎকার। ওর জোড়হাত। চোখ বোজা। কামারের হাতের আঙটার মুখ বিদ্যুৎগতিতে গিঁথে যায় পিঠের শক্ত চামড়ায়, এফোঁড় ওফোঁড় করে ঝুলতে থাকে। একের পর এক দুই তিন কি আরো বেশি আঙটা এভাবে চামড়ায় গিঁথে যায়। দড়িদড়াগুলো গুটিয়ে গলায় জড়ান। চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্তের ফোঁটা তেলচুকচুকে কালচে পিঠ বেয়ে গড়াতে থাকে। রক্তে ভিজে যায় পরনের কাপড়চোপড়ও। পনেরো বছরের কিশোরটি থেকে শুরু করে সত্তর বছরের লোলচর্ম বৃদ্ধটির শরীরের জায়গায় জায়গায় পুরোনো বাণফোঁড়ার শুকনো ক্ষতের মত দাগ। গুনে গুনে বলে দেওয়া যায় গাজনে কে কতবার নেমেছিল পুণ্যি কুড়োতে। বাপ ঠাকুরদার

আমল থেকে বংশে গাজনে পিঠফোঁড়ার চল থাকলে ছেলে বড় হতে না হতেই মানত করে পিঠ, জিভ কিংবা রজনী ফুঁড়তে নামে।

ক'টাই বা মানুষ জিভ ফোঁড়ে। এও বংশপরম্পরা মানত মেটাতে মেনে চলছে ক'ঘর ভূমিজ সিং সরদারেরা। পিঠফোঁড়ের নৃশংসতার সাক্ষীদের গায়ের কাটা মিলোতে না মিলোতেই জিভফোঁড়ার পাট শুরু। বিঘত-খানেক লম্বা গোটা পাঁচ সাত লোহার ত্রিশূল নিয়ে কামার খাড়া। কোন মায়া দয়া না করে টেনে হিঁচড়ে আধহাত জিভ বার করানো হয় ভক্তের। একমুহূর্ত দেরি না করে ত্রিশূলের ছুঁচলো ডগাগুলো জিভে গেঁথে বসিয়ে দেওয়া হয়। এফোঁড় ওফোঁড় করে বেরিয়ে যায় সেগুলো। একের পর এক, ডাইনে বাঁয়ে। মানুষটার চোখদুটো যেন ছিটকে বেরিয়ে আসে। গোলাপী ঠোঁটদুটো হাঁ করে স্থির, একচুল নাড়ালেই জিভ ছিঁড়ে দু টুকরো হয়ে যেতে পারে। এতকিছু, তবু একফোঁটা রক্তও ঝরে না।

ওরা আবার ফেরে। বেলা পড়ে আসছে, জমিতে লটকে থাকা চড়ককাঠের লম্বা ছায়া মন্দির ছুঁই ছুঁই। জিভফোঁড় পিঠফোঁড়ের ভক্তরাও আজকের দিনের জন্য ভোক্তা—ব্রাহ্মণের পিছু পিছু চড়ককাঠে প্রদক্ষিণ সেরে ঢুকে পড়ে গাজনের আসরে। তখন আগুনপাটের যোগাড়যন্ত্র শেষ। আট, দশ গজ জমিতে কোদাল চালিয়ে মাটি তুলে খানিকটা গর্ত মতো করা, তার ভিতরে গুমে গুমে পোড়াকাঠ জ্বলছে সেই সকাল থেকে। কাঠকয়লায় সে গনগনে আঁচের চেয়ে চৈত্রের দুপুরের রোদ্দুর অনেক মিঠে। ওই আগুনের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে হবে ভোক্তাদের, কোন কেরামতি নেই, ভেলকি দেখিয়ে লোক ঠকিয়ে বাহাদুরী নেবার ফুরসত নেই—ওদের কাছে এ কঠিন বিশ্বাসের প্রশ্ন। এ গাঁয়ে যার নাম আগুনপাট, বিহারের ছোটনাগপুরের আদিবাসী মুণ্ডাদের গাঁয়ে সেই একই রাতে আগুনে হাঁটার যে উৎসব হয়, সে পরবের আঞ্চলিক নাম—মাণ্ডা। জায়গায় জায়গায় একটু অদলবদল থাকলেও মূল ব্যাপারটুকু প্রায় একই।

ওপারে চোখের সামনে সোজা মন্দিরের শিবলিঙ্গ, মাঝখানের আগুন অন্যদিকের ভোক্তারা একে একে মন্দিরমুখী এগোয়। আগুনে পা দেবার আগের জায়গাটুকুতে পুকুরের জলো শ্যাওলা ঝাঁঝি বিছোনো, তা মাড়িয়ে ভোক্তা সোজা পা ডোবায় একটি কলাপাতায় রাখা কাঁচা দুধে। এক মুহূর্ত থামা। তারপরই পা রাখে গনগনে আগুনে, আশপাশ থেকে কুলোর বাতাসে ছাই উড়ে, লাল আগুন ফুটে বেরোয়। সাদামাটা চলার গতি। চার-পাশের মানুষগুলো চোখে পলক ফেলার আগেই আগুন মাড়িয়ে ভোক্তা পৌঁছে যায় মন্দিরের উঠোনে। বিস্ময়ের ঘোর লাগা মানুষগুলোর শরীর নুয়ে পড়ে মন্দিরের শিলার উদ্দেশ্যে। চোখের পরখ মনের বিশ্বাসকে সোনার কাঠির ছোঁয়ায় জীয়ন্ত করে তোলে।

আগুনপাট চলতে থাকে, অন্যদিকে চড়ককাঠে ওড়ম্ভ শুরু। চারহাতি গামছার ভারে ভোক্তার সারা শরীর ঝুলতে থাকে ছোটখাটো তালগাছ-প্রমাণ উঁচু চড়ককাঠে। ঘুরতে ঘুরতেই, ছুঁড়তে থাকে বাবার প্রসাদী কলাটা মুলোটা। আদিবাসী পাড়ার সরদারদের দল জিভফোঁড় অবস্থাতেই চড়ককাঠে ওঠে।

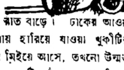
সন্ধ্যা নামে, ধুলোর ঝড় বয়ে যায় কাল-বৈশাখীর ছোঁয়াচ দিয়ে। মেলা সরগরম। দূরের কেলেঘাই নদীর পাড় থেকে নাচতে নাচতে সরদারপাড়ার একদল এগিয়ে আসে, ওদের মুখে ভুরভুর করে মহুয়ার গন্ধ, মুখে প্রাণখোলা পরবদিনের হাসি। ওদের একে অপরের সঙ্গে বাঁধা পড়েছে। দু হাতের পেশীতে ফুটো করে দড়ি ঢোকানো, দড়ি দুটো সবার



আদিবাসীদের জিভফোঁড়, পিঠফোঁড়ের শেষে

হাত ফুঁড়ে চলে গেছে। ওদের হুঁশ নেই। ধমসা ঢাকের বোল ওদের রক্তে কোটালের বান জাগিয়েছে। পা মিলিয়ে শরীর হেলিয়ে উদ্দাম নাচ নেচে যায়। সবার হাতে বাঁকা-চোরা লাঠি, গাজনতলার ধুলোমাটিতে রক্ত পড়তে থাকে ওদের শরীর বেয়ে ঝোপে বৃষ্টি ঝরার মতো, বড় বড় ফোঁটায়।

ব্রাহ্মণ ওদিক মন্ত্র পড়ছে শিবের ধ্যানের 'জবাকুসুমং সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং…'। পণ্ডিত বিচারে এ সব ভুল। সাজানো। নিছক আদিমতাকে হিন্দু ধর্মের নামাবলী গায়ে চাপিয়ে শুদ্ধিকরণের চেষ্টা, যা সময়ে সময়ে ঘটেছিল আদিবাসী সংস্কৃতির গভীরে। মানুষ যে সব ঘটনার ব্যাখ্যা খুঁজে হাতড়িয়ে পায়না, তাতেই অলৌকিকত্ব চাপায়। জিভ-ফোঁড়, পিঠফোঁড়, রজনীফোঁড়ের যন্ত্রণার লাঘব করতে রাতভোর মদের নেশা কিম্বা আগুনপাটে পায়ে ফোস্কাটুকু না পড়ার পেছনে কাঁচা দুধ কি ঝাঁঝির মাহাত্ম্যের দিকে শহুরে আলোয় অভ্যস্ত চোখ আড়েআড়ে তাকায় তাই মাটির কাছাকাছির মানুষের বিশ্বাসের শক্তির বহরটুকু কোন ইন্দ্রিয়ে ছোঁয়া পড়ে না।



রাত বাড়ে। ঢাকের আওয়াজ বেসুরো মেলায় হারিয়ে যাওয়া খুকীটির কান্না ক্লান্ত হয়ে মিইয়ে আসে, তখনো উন্মত্ত গাজন নাচ চলছে, মাটি কাঁপে থরথরিয়ে। চোখে পড়ে, দূরে এক সরদার ভোক্তা দাঁড়িয়ে। একটু আগেও ওর জিভে পাঁচ পাঁচটা শূল বিঁধে ছিলো। এখন খুলে ফেলে দিব্যি তারিয়ে তারিয়ে জিলিপি কিনে খাচ্ছে। চোখেমুখে খুশি উপচে পড়ে। পিঠের রক্তের ওপর পোড়া কাঠকয়লা আর গাজন-তলার ধুলোর কালচে জমাট পুলটিশ। কাটা জায়গাটা দেখাতেই হেসে কপালে হাত ঠেকায়—'বাবার ওষুদ বটে, ইতেই কাজ দিবে গ।' হাসতে হাসতে গলার চাঁপার মালা খুলে হাতে নেয়। এগিয়ে আসে। ওটা ও নিজে হাতে পরিয়ে দেবে আমার গলায়। অতিথ যে! ছাড়বে না। ওর মুখে ঝাঁঝালো গন্ধ। দূরে জুলজুল করে তাকিয়ে রয়েছে ওর বিশবছরের বউ। ওরা মানত করেছিল—কোলজুড়ে একটা খোকা আসুক।…শিবো হে! সারাটা বছর ধরে ও সময় গুনছিল এ মালাটার জন্যে।

মানতের মালা ঝুপ করে আমার গলায় পড়লো। চাঁপার গন্ধ মিলেমিশে যায় মহুয়ার ঝাঁঝে। মশালের আলোটুকুতে ঠাহর হয়না, পায়ের তলায় ধুলোর বুকে ফোঁটায় ফোঁটায় কত রক্ত যুগ যুগ ধরে এ গাজনতলায় জমে রয়েছে। ★



আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত

ছবি এঁকেছেন: অরুণ চট্টোপাধ্যায়



বীরভূমের বাউল

অমিত গুপ্ত

বোলপুর থেকে পায়ে হেঁটে বা রিকসায় শ্রীনিকেতনের পথে বাঁধগড়া। বাঁ হাতে বেশ কিছুটা এগিয়ে মন্দিরের কাছেই রামানন্দ দাসের আখড়া। মাটির ঘরে বাউলের সংসার। দু'হাত তুলে আমন্ত্রণ—'ভক্ত বড় শক্ত কথা'। একতারা হাতে নিয়ে গান ধরলো 'আমার কাজ কি লোটা ভোট কম্বলে সম্বলের নাই প্রয়োজন, কতদিনে কতদিকে দীনহীনের ভাব ধরবি আমার মন—।' তারপর অঝোরে কিছুক্ষণ কেঁদে উঠে গাঁজার কল্কে সাজিয়ে নেয়। আবার হাসে।

পৌষ মাসের সংক্রান্তির দিন থেকে তিন-দিন জয়দেবের কেঁদুলিতে বাউলের মেলা। অজয় নদের পারে সারা গ্রাম জুড়ে বাউলের আখড়া বা আশ্রম। সারারাত ধরে বাউলের গান। শীতের অহংকার ভাঙে বাউল পবন দাস। রাত্রির তন্ময়তা ভেঙে ভোর হয়ে আসে পবন দাসের গানে। ওর ডুবকীর তাল ও নাচের ছন্দ মনে বসন্ত এনে দেয়।

আসুন গোপাল নগরে। বোলপুর থেকে কুড়ি মিনিট বাসে। ইসলামবাজার যাবার পথে। খেত চিরে আলরাস্তা। সামনেই উঁচু উঁচু পাঁচিলের মত ঢিপির অন্তরালে সায়ের বা পুকুর। আম, জাম, অশ্বত্থ গাছ ঘিরে উন্মুক্ত ময়দান। এখানে নিঃসঙ্গতাই একমাত্র সঙ্গী। মাঘী পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় এখানে মেলা বসে পূর্ণদাস বাউলের। অন্যসময় এই তিরিশ বিঘে উদ্যানে দেখতে পাওয়া যাবে পূর্ণদাসের দিদি রাধারানী দাসী ও তার স্বামী —ধনঞ্জয় দাসকে। ময়দানে দুটি মাটির ঘর সারা বছর মানুষের প্রতীক্ষায় থাকে। এই গ্রামেই পূর্ণদাসের বাবা নবনী দাসের আশ্রম। এখন এখানে থাকেন নবনী দাস বাউলের স্ত্রী ব্রজবালা দাসী ও তার এক পুত্র—চক্রধর দাস বাউল। নবনীদাস অনেকদিন আগেই দেহ রেখেছেন।

বাউল নিজেকেই সবচেয়ে বেশি ভালো-বাসে। তাই তাদের এত দেহচর্চা, এত বিচিত্র পোশাক-আশাক ও সাজ-সজ্জা। বিভিন্ন ধরনের জামা, আলখাল্লা, পানজাবি, জোব্বা, মাথায় পাগড়ি। গেরুয়া ছাড়াও হলুদ, লাল, বাসন্তী রং। নানান ডিজাইন। গলায় পুঁথি বা তসবীর মালা। চমৎকার পাথর ও পুঁথি। বিভিন্ন আকৃতির। এরা সংগ্রহ করে দেশ বিদেশ ঘুরে। কিংবা জয়দেব-কেঁদুলির মেলা বা পাথরচাপুড়িতে দাতাসাহেবের মেলা থেকে। তুলসী কাঠ বা বেলকাঠ থেকে ছোট কিংবা বড়ো কাঠের পুঁথির মালা বাউলরা গলায় পরে। এর নাম কণ্ঠিমালা। এই কণ্ঠিমালা বিনিময় করেই বাউলদের বিবাহ। কেঁদুলির মেলায় অজস্র কণ্ঠিমালা বিক্রি হয়। দরবেশ সম্প্রদায় এবং ফকিরদের গলায় থাকে তসবীর মালা। দামী পাথরের তৈরি এই মালা দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনি ভারী। বীরভূম জেলার পাথরচাপুড়ি বা দাতাসাহেবের মেলায় কিনতে পাওয়া যায় তসবীর মালা। এই মেলা হিন্দু ও মুসলমান, ফকির ও বাউলের মেলা। এখানে দাতা সাহেবের মাজার দ্রষ্টব্য। মেলার সময় মাজারে দামী সিল্কের চাদর দান করেন ভক্তরা। সারা দিনরাত গান আর গাঁজা চলে। মেলা বসে দশ থেকে বার চৈত্র।

বাউলের গৃহসজ্জা অভিনব। বিভিন্ন দেব-দেবীর ও নানারকম ছবি দিয়ে মাটির দেয়াল সাজানো। দেয়ালের গায়ে ঝুলছে একতারা, গাবগুবি বা খোল। কড়োয়া, চিমটে, প্রেম-কাঠ এবং প্রেম-কাটারি বাউলের একান্ত সঙ্গী। প্রায় সব বাউলের কাঁধেই ঝুলতে দেখা যায় ছোট্ট একটি ঝোলা, যাকে বলে অচলা বা ভেখ। ঘরের সামনে তুলসী-মঞ্চ। বাউলদের যেখানে সমাধি দেওয়া হয় সাধারণত সেখানেই আশ্রম গড়ে ওঠে।

বিশ্বনাথ দাসের ঘরে একবার পৌঁছালে ফিরে আসতে মন চাইবে না। দাওয়ায় হাতে বোনা পাটের আসনে বসে ওর স্ত্রীর হাতের রান্না, মাটির দোতলা ঘরে পরিচ্ছন্ন শয্যায় টানটান কিংবা বিশ্রামের শেষে বিশ্বনাথ দাস ও তার ছেলেদের—আনন্দ ও নীতুর-গলায় গান শুনে ইচ্ছে করবে আজ থাক যাওয়া। মনে হবে ঘরের পারে দীঘি, দীঘির পারে রেল-লাইন। মাঝে মাঝে ট্রেনের হুইসেল, ইনজিনের ধোঁয়া, অভিমানী মেঘ কিংবা ধূ ধূ ডাঙা কৈশোরের স্মৃতি বয়ে আনে।

গোপন কিছু মনের কথা কিংবা দেহের খবর জানা যায় বাউলের আলোচনার মধ্যে দিয়ে। মানুষের প্রতি মানুষের আস্থা, অস্তিত্বের জন্যই এই ব্রহ্মাণ্ড মনের মানুষ কিংবা প্রেম বিষয়ক রহস্যময় তত্ত্ব দিয়ে বাস্তব জীবনকে আরেকবার যাচাই করা যেতে পারে। স্বচ্ছন্দে অবসরের কটা দিন কাটতে পারে মাটির ভিটে, খড়ের চালের আস্তানায়। কিংবা গান শুনে বিভোর হয়ে থাকতে পারেন যেমন খুশি। জীবনের একঘেয়েমী কাটিয়ে উঠে যৌবনের গতি পাওয়া যায়। অভাব, দ্বন্দ্বে, সংকট, শ্রম, ভালবাসা, সমস্যা এবং সহনশীলতার ভিতর দিয়ে বেঁচে থাকার অন্য এক অর্থ এখানে ধরা দেয়। ★

আলোকচিত্র : বরুণকান্তি চট্টোপাধ্যায়



এই পক্ষ

[এপ্রিল ১৬ থেকে ৩০]

মেষ : মাঝে মাঝে অসুস্থতা মানসিক শান্তি নষ্ট করবে। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে বেশ কিছু সঞ্চয় হবার সম্ভাবনা। কর্মস্থলে কারও অসহযোগিতা সাময়িক বিপাকে ফেলতে পারে। আয়বৃদ্ধির ইংগিত। মেয়েদের কর্মস্থলে কোন সিদ্ধান্তে দৃঢ় থাকা প্রয়োজন। পারিবারিক ক্ষেত্র অশুভ বন্ধুদের সঙ্গে মনোমালিন্য। মেয়েদের কোন প্রিয়জনের সঙ্গে মনান্তর। স্ত্রীর কোন রোগ বাড়তে পারে। সন্তানদের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। বিশেষ কোন ব্যক্তির, সংস্পর্শ আত্মিক উন্নতির সহায়ক হবে। ব্যবসায়ীদের অশুভ। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার অর্থলাভ।

বৃষ : আকস্মিক অসুস্থতা বেশ বিপাকে ফেলতে পারে। পক্ষ মাঝামাঝি সময় থেকে আর্থিক অবস্থার ক্রমিক উন্নতি। কর্মক্ষেত্রে নতুন কোন ঝামেলা দীর্ঘস্থায়ী হবার আশংকা। মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে স্বীয় প্রচেষ্টায় বাধা। মোটামুটি আয়-বৃদ্ধি। পারিবারিক ক্ষেত্রে কোন বিষয়ে আশাভঙ্গ। কোন বন্ধুর অযাচিত সাহায্য পরিণামে শুভ। অবিবাহিতদের বিবাহ ব্যাপারে যোগাযোগে বাধা। সন্তানদের কারও স্বাস্থ্য সম্পর্কে দুশ্চিন্তা। ব্যবসায়ীদের নতুন বিনিয়োগে বাধা। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার মানসিক অশান্তি।

মিথুন : শরীর মাঝে মাঝে উৎপাত করবে। আর্থিক ব্যাপারে অনিশ্চয়তা। কর্মক্ষেত্রে নানান ঝামেলা সত্ত্বেও নিজ মতে অবিচল থাকা প্রয়োজন। আয়বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় আংশিক সাফল্য। মেয়েদের কর্মস্থলে প্রতিকূল অবস্থা বিব্রত করবে। পারিবারিক ক্ষেত্রে স্বজন-কলহ ও বিরোধ। প্রতিযোগিতামূলক কর্মে সাফল্য। মেয়েদের আর্থিক ক্ষতি। কোন প্রিয়জনের আকস্মিক বিয়োগ হতে পারে। ব্যবসায়ীদের পক্ষ মাঝামাঝি পর্যন্ত সময় অনুকূল নয় এই লগ্নের জাতক-জাতিকার অপযশ।

কর্কট : পুরনো কোন রোগ বাড়তে পারে। ব্যয়ের চাপ চললেও ভাল সঞ্চয় আশা করা যায়। কর্মক্ষেত্রে শত্রুরা সক্রীয় হবে। মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে কোন ব্যাপারে দুর্নাম হতে পারে। নানা ভাবে আয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পারিবারিক ক্ষেত্রে কোন সমস্যার হঠাৎ সমাধান। মেয়েদের মানসিক উদ্বেগ। দাম্পত্য জীবনে সাময়িক অশান্তির আশংকা। জমি, বাড়ি ক্রয়/বিক্রয় ব্যাপারে নতুন যোগাযোগ। ব্যবসায়ীদের অর্থ-সংক্রান্ত ঝামেলা। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার ধনবৃদ্ধি।

সিংহ : শরীর নিয়ে অল্পস্বল্প দুশ্চিন্তা। ছোটখাট দুর্ঘটনা সম্পর্কে সাবধান। ব্যয়াধিক্য চলবে। সঞ্চয়ের প্রচেষ্টা সফল হবে না। কর্মক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের তৎপরতা সত্ত্বেও সুনাম ও পদমর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে। মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব আসতে পারে। ভাল-রকম আয়বৃদ্ধি আশা করা যায়। বিশেষ কোন প্রিয়জন ভুল বোঝবার ফলে পারিবারিক ক্ষেত্রে অশান্তি। মেয়েদের প্রেম-প্রণয় ব্যাপারে আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হতে পারে। ব্যবসায়ীদের নতুন ঝামেলা। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার লাভ।

কন্যা : শরীর অশান্তির কারণ হবে। সামান্য অসুস্থতাও মারাত্মক হতে পারে। আয়-ব্যয়ে সমতা না থাকলেও অল্প-বিস্তর সঞ্চয় হবে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির পথে বাধা। মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে অতি প্রিয় বা বিশ্বস্ত কেউ ক্ষতি করতে সচেষ্ট হবে। আয়বৃদ্ধি আশা করা যায় না। পারিবারিক ক্ষেত্রে স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর মতের প্রচণ্ড অমিল। কর্মপ্রার্থীদের সাময়িক কোন যোগাযোগ ঘটতে পারে। ব্যবসায়ীদের ক্ষতির আশংকা। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার হঠাৎ অর্থনাশ।

তুলা : শরীর সম্পর্কে হুঁসিয়ার থাকা দরকার। সঞ্চয়ে বাধা, যত আয় তত ব্যয়। কর্মস্থলে গুরুত্বপূর্ণ কোন ব্যাপারে কারও আকস্মিক সহযোগিতা। মেয়েদের কর্মস্থলে প্রতিযোগিতামূলক কোন ব্যাপারে অসাফল্য। সামান্য আয়বৃদ্ধি হতে পারে। পারিবারিক ক্ষেত্রে ভাই-বোনেদের সঙ্গে মতের অমিল। দাম্পত্য জীবনে অশান্তি। বন্ধুদের কোন কোন ক্ষেত্রে এড়িয়ে চলতে পারলেই ভাল। জমিজমা ক্রয়ের ব্যাপারে ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না। ব্যবসায়ীদের নতুন ঝামেলা আসবে। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার মানসিক অশান্তি।

বৃশ্চিক : স্বাস্থ্যহানির আশংকা। সঞ্চিত অর্থে টান পড়বে, সঞ্চয়ের আশা দুরাশা। কর্মস্থলে কোন বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হবে না। মেয়েদের কর্মস্থলে অশান্তি নতুন দিকে মোড় নেবে। আয়-বৃদ্ধিতে বাধা। পারিবারিক ক্ষেত্র অশুভ আত্মীয়স্বজনেরা ভুল বুঝবে। মেয়েরা বন্ধুদের দ্বারা প্রতারিত হতে পারে। কোনো রিপুর তাড়নায় সম্মানহানি হতে পারে। ব্যবসায়ীদের বকেয়া টাকা উদ্ধার হবে। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার কর্মে বিলম্বে সাফল্য।

ধনু : স্বাস্থ্য ভাল চলবে। পুরনো কোনো রোগের আকস্মিক নিবৃত্তি। সঞ্চয় হওয়া মুশকিল। কর্মস্থলে হাজারো ঝামেলায় বিব্রত হবার সম্ভাবনা। কোন কোন ক্ষেত্রে কর্মচ্যুতিও হতে পারে। মেয়েদের কর্মস্থলেও সময় প্রতিকূল। পারিবারিক ক্ষেত্রে পুরনো কোন সমস্যার অভাবনীয় সমাধান। ভাই-বোনেদের সঙ্গে মনোমালিন্য হেতু মানসিক অশান্তি। মেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে সহজ যোগা-যোগ হবে। লটারিতে সামান্য লাভ হতে পারে। ব্যবসায়ীদের মন্দা চলবে। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার কর্মে অসাফল্য।

মকর : ভাল-মন্দ মিলিয়ে চলবে শরীর। সঞ্চিত অর্থ ক্ষয় ভাল রকম ঋণও হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তনের ভাল সুযোগ আসতে পারে পক্ষের মাঝামাঝি। মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে সুনাম ও উন্নতি। পারিবারিক ক্ষেত্রে ছোটখাট বিষয়ে প্রবল অশান্তির আশংকা। ভৃত্যদের দ্বারা ক্ষতির আশংকা। মেয়েদের আকস্মিক কিছু অর্থপ্রাপ্তি। প্রেম-প্রণয় ব্যাপারে মেয়েদের ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন। ব্যবসায়ীদের নতুন ঝামেলা, আর্থিক ক্ষতি। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার ভ্রমণ।

কুম্ভ : শরীর নিয়ে পক্ষ জুড়েই চলবে দুর্ভাবনা। আর্থিক সমস্যা জটিলতর হবে। সঞ্চিত ধনক্ষয়। কর্মক্ষেত্রে নানা দিক থেকে অশান্তি, সম্মানহানি। মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে উন্নতির পথে বাধা। সামান্য আয়বৃদ্ধি হতে পারে। পারিবারিক ক্ষেত্রে আত্মীয়স্বজন মনো-কষ্টের কারণ হবে। বন্ধুদের কাছ থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা পাওয়া যাবে। মেয়েদের আগুনের থেকে বিপদ আসতে পারে। প্রতিযোগিতামূলক কাজে দেরিতে সাফল্য। ব্যবসায়ীদের লাভ। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার স্বীয় প্রচেষ্টায় বাধা।

মীন : শরীর নিয়ে ভালরকম বিব্রত হতে পারে। ছোটখাট অসুস্থতা ভীষণ আকার ধারণ করতে পারে। সঞ্চিত অর্থে মাঝে মধ্যে টান পড়বে। কর্মস্থলে কোন বিষয়ে নিজ সিদ্ধান্তে অবিচল থাকা প্রয়োজন। মেয়েদের পক্ষশেষের দিকে, পরিবর্তনের নতুন কোন সুযোগ আসতে পারে। আয়বৃদ্ধি বিশেষ আশা করা যায় না। পারিবারিক ক্ষেত্রে অনেক সমস্যার সমাধান ; কোন ক্ষমতা-শালী ব্যক্তির কাছ থেকে আকস্মিক সহযোগিতা আসতে পারে। ভৃত্যদের থেকে সাবধান। মেয়েদের অকারণ দুর্নাম। ব্যবসায়ীদের ক্ষতি। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার বন্ধু বিচ্ছেদ।

শ্রীভৃগু



বাংলা ছবি এত ফ্লপ করে কেন ?

ভাস্কর চৌধুরী



গত দশ বছরে মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা ছবির মোট সংখ্যা ২৯৩। এর মধ্যে জনপ্রিয় ছবির সংখ্যা গোটা পঞ্চাশ। অর্থাৎ প্রায় ২৫০টি ছবিকেই দর্শকেরা পরিত্যাগ করেছেন।

কেন এমন হয় ? ২৯৩টির মধ্যে ২৫০টি ছবিই বাতিল হয় কি কারণে ? অথচ এমন তো কয়েক বছর আগেও ছিল না।

কমতে কমতে গত দশকে মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা ছবির সংখ্যা দু'বছরে দাঁড়িয়েছিল ২৫টিতে। '৭২ ও '৭৫ সালে ঐ সংখ্যক ছবিই মুক্তি পেয়েছিল। '৭৭ সালে ঐ সংখ্যা বেড়ে হয় ৩৮ কিন্তু তাতে আনন্দ পাওয়ার কিছু নেই, কেননা তার পরের বছর ঐ সংখ্যা নেমে আসে ৩০টিতে। সারা সত্তর দশকে মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা ছবির গড় সংখ্যা হলো ২৪টির মতো। বছরে ২৪ বা মাসে দুটি করে।

আশ্চর্যের ব্যাপার—সেগুলিও দর্শকরা দেখেন না। দর্শকদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। মনের মত ছবি না হলে তারাই বা পয়সা খরচ করে দেখবেন কেন ?

অথচ দেখুন দক্ষিণ ভারতকে সেখান-কার ছবির সংখ্যাই শুধু নয়, ছবির মানও কি দ্রুত উন্নতি লাভ করছে।

তালিকাটা একবার দেখুন। ১৯৭৯ সালে সেনসারের ছাড়পত্র নিয়েছে তামিল ছবি ১৪০, তেলেগু ১৩৩টি, মালয়ালম ১৩১টি, হিন্দি ১১৪টি, কানাড়ি ৫৯টি গুজরাটি ৩৮টি আর বাংলা ছবি ৩৭টি

এ তালিকায় চোখ রাখলেই বোঝা যায়, আমরা কত পিছিয়ে পড়ছি। দিনের পর দিন বাংলা ছবির সংখ্যা কমছে, কমছে তার দর্শক সংখ্যা। এ অবস্থায় একই মানের বছরে পঞ্চাশটা ছবি মুক্তি পেলেও আদতে লাভ কিছুই হবে না, ফ্লপ ছবির সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি পাওয়া ছাড়া। এখন এমন দর্শকও তৈরি হয়ে গেছেন যারা বাংলা ছবির নাম শুনলেই নাক কুঁচকে খারাপ কোন মন্তব্য ছুঁড়ে দেন। এদের সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে।

মূলত দায়ী কিছু অক্ষম পরিচালক। তারা নিজেদের অজান্তেই বিপুল হারে ফ্লপ ছবি নির্মাণ করে এমন দর্শক তৈরি করে ফেলেছেন। জনসংখ্যা বাড়ে, বাংলা ছবির দর্শক বাড়ে না কেন ? বাড়বেই বা কি করে ? বর্তমানে শতকরা ৮৫টি ছবিই দেখার অযোগ্য। কজনেরই বা এত সময় আছে যে ভাল ১৫টি ছবি বেছে নিতে এগিয়ে আসবেন ? বাছবেনই বা কি করে ?

কেন বাংলা ছবি ফ্লপ করে ? আসুন এবারে সেই কারণগুলোর দিকে চোখ রাখি।

অযোগ্য পরিচালনা : কেউ যদি প্রশ্ন করেন বাংলা চিত্রজগতে কোন কাজটি সব থেকে সহজে করা যায়, তাহলে তার একটিই উত্তর—চিত্র পরিচালনা।

টেকনিক্যাল বিভাগগুলো তো বটেই, কোন কোন ননটেকনিক্যাল বিভাগে কাজ করতে হলে আপনাকে গীল্ডের অনুমতি নিতে হবে। কখনও কখনও যোগ্যতার প্রমাণ দেবার জন্য আপনাকে পরীক্ষাতেও বসতে হবে। অথচ পরিচালক হতে গেলে কোন যোগ্যতা আপনার না থাকলেও চলে যাবে শুধু একটি গুণ আপনার থাকা দরকার। হলো প্রযোজক পাকড়ানো। ঠিক মত প্রযোজক পাকড়াতে পারলে কোন কাজ না জানলেও আপনি রাতারাতি চিত্র পরিচালক হয়ে যেতে পারবেন।

এ ধরনের ভেজাল পরিচালকেই সংখ্যাই এখন সব থেকে বেশি। আর এদের হাতে পড়ে বাংলা ছবি ক্রমশ সংখ্যায় কমছে।

যে কোন কাজে, বিশেষত চিত্রনির্মাণের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা একটি মস্তবড় মূলধন। এর অভাব রয়েছে বলেই অনেক বাংলা ছবি এখন হালে পানি পাচ্ছে না। নামী-দামী শিল্পী দিয়ে কিংবা ছবি রঙিন করেও ব্যবসা হচ্ছে না।

অনেকে হয়ত দু'একটা উপমা তুলে বলতে পারেন, অমুক নতুন পরিচালকের তো কোন অভিজ্ঞতা ছিল না, তাহলে ওর ছবি দর্শকেরা নিলেন কেন ? হল ভর্তি করে সিলভার জুবিলি হলো কি করে ?

অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে কি অমন দু একজন ভাগ্যবানকে খুঁজে বের করা যাবে না ? যাবে। তাদের সাফল্যের গোপন কথাটি হলো তাদের সহকারীর খুব অভিজ্ঞ কোন সহকারী পরিচালক নিয়ে কাজ করে অমন ফল কেউ কেউ পেয়েছেন এমনও দেখা গেছে, পরিচালক ফ্লোরে নেই, অথচ শ্যুটিং চলছে। কিংবা পরিচালক ফ্লোরে থাকা সত্ত্বেও হয়ে আছেন নির্বাক কাজ যা করার তা করছেন ঐ প্রধান সহকারী বা সহযোগী পরিচালক। ঐ জোরেই সাফল্যের সিংহদুয়ার দু একজন স্পর্শ করেছেন। কিন্তু তা বারবার হয় না। অচিরেই নানা কারণে মতবিরোধ শুরু হয়ে যায় সহকারীর সঙ্গে। ব্যস, পরিচালকটিও কানা হয়ে পড়েন।

তাহলে কি বলা চলে, শুধু অভিজ্ঞতা থাকলেই ভাল পরিচালক হওয়া যায় ? মোটেই না। বহু অভিজ্ঞ সহকারী পরিচালক স্বাধীনভাবে ছবি করতে এসে তা হলে ডুবতেন না। আসলে, চিত্রনির্মাণের ক্ষেত্রেও মাত্রা-জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। ওর অভাব ঘটলেই সব গেল। বেশিরভাগই এ সত্য কথাটা বোঝেন না, কিংবা মানতে চান না, আবার অনেকে বুঝতে পারলেও তা কাজে লাগাতে পারেন না।

সেই সঙ্গে সাহসের অভাব তো আছেই। সাহস করে, অগ্রণী হয়ে কিছু করব এ ইচ্ছাটা অনেক পরিচালকের মনে থাকলেও তারা কিন্তু কাজে তা প্রয়োগ করেন না। বিপদ আসার সম্ভাবনা দেখলেই তারা সযত্নে চিরাচরিত পথে হাঁটা শুরু করেন।

'যে যে কারণে অতীতে কোন ছবি জন-প্রিয়তা পেয়েছিল, অতএব এস আবার সেই কারণগুলোকেই কাজে লাগাই'। এই হয়

ছবি / ...

তাদের মূলবাক্য। কিন্তু এতেও শেষরক্ষা হয় না। অবশ্য এ ব্যাপারে শুধু পরিচালকদের দোষ দিলে অন্যায় করা হবে। কিছু প্রযোজক এবং ধর্মতলা পাড়ার কিছু পরিবেশকও এর জন্য দায়ী। তারা অনেক সময় পরিচালককে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য করান।

এ প্রসঙ্গে গত বছরের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। কোন একটি ছবির শেষাংশে ছিল নায়ক মারা যাচ্ছে। গল্প অনুযায়ী তাই হতো বাস্তবোচিত। কিন্তু প্রযোজক ও পরিবেশক আবদার ধরলেন, না নায়ককে মারা চলবে না, ওকে যেমন ভাবে হোক বাঁচিয়ে তুলতে হবে। না হলে গ্রামবাংলার দর্শকেরা ছবিটা দেখবে না। আর মফঃস্বল না দেখলে তো ছবি ডুবলো। পরিচালক অনেক ভেবেও কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারলেন না। তখন উনি করলেন কি, নায়কের মৃত্যু হওয়া এবং মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যাওয়া এ দুটি দৃশ্যই টেক করে রাখলেন। ছবিটির মুক্তির দিন দর্শকেরা দেখলেন ছবির নায়ক মারা গেলেন। কিন্তু পরবর্তী শো-এর দর্শকেরা নায়ককে বেঁচে থাকতেই দেখলেন।

সম্প্রতি তো একটা জিনিস টালিগঞ্জ পাড়ায় হামেশাই ঘটতে দেখা যায়, তা হলো ছবি মুক্তির পরে সেই ছবির পুনরায় শুটিং করে ক্ষতস্থানে প্রলেপ দেওয়া। উত্তরোত্তর এ সংখ্যা বেড়েই চলছে।

খ) কাহিনী ও চিত্রনাট্যের ত্রুটি : সব কাহিনীরই ছবি হয় না। এটাও বোঝেন খুব কম মানুষ। ফলে, অপাংক্তেয় কাহিনীর চিত্ররূপ দেখতে বসে দর্শকেরা হন বিরক্ত। আবার ছবির প্রয়োজনের ধুয়ো তুলে সুন্দর গল্পকে এমন বিচ্ছিরি করে তোলা হয় যে বেশিরভাগ সময়েই সে ছবি দর্শকদের আনন্দ-দানের বদলে দুঃখই দিয়ে থাকে।

বাংলা ছবির কাহিনী থেকে গ্রাম বাংলা অনেক আগেই বিদায় নিয়েছে। অধিকাংশ ছবিই হয় এখন শহরভিত্তিক। স্নো-পাউডার মাখানো মোটা দাগের গল্প। বাস্তবের ছোঁওয়া তাতে থাকে না বললেই চলে। অথচ বছর বারো আগের বাংলা ছবিতেও স্বকীয়তা ছিল। তাই সেসব ছবি মুক্তি পেলে লোকে আজো ভিড় করে দেখেন। দেখা ছবি একাধিকবার দেখতেও তাদের কুণ্ঠা নেই। কিন্তু নতুন ছবি হলেই তারা পিছিয়ে যান।

তা বলে কি গ্রামভিত্তিক বাংলা ছবি হচ্ছে না? হচ্ছে, তবে সবই সাজানো গোছানো। যার মধ্যে থেকে প্রকৃত বা বাস্তব গ্রামকে খুঁজে পেতে গেলে রীতিমত গবেষণা করতে হবে। প্রাণের স্পর্শ থাকে না বললেই চলে। ভরসার কথা—হাওয়া বদলাচ্ছে। ইদানীংকালে মুষ্টিমেয় যে কটি বাংলা ছবি জনপ্রিয়তা পেয়েছে, তার বেশিরভাগই গ্রামভিত্তিক।

বাংলা সাহিত্যে অজস্র কাহিনী ছড়িয়ে আছে যা দিয়ে সার্থক চলচ্চিত্র তৈরি করা যায়। প্রতি বছরই আট-দশটা সাহিত্য-নির্ভর কাহিনী নিয়ে ছবি তৈরি হয়ে থাকে। কিন্তু তার অধিকাংশই হয় শিব গড়তে বাঁদর গড়া।

এমনটিই হয়, কেননা অনেকেরই জানা নেই সব কাহিনী থেকে ছবি হয় না। এবং কি ভাবে চিত্রনাট্য তৈরি করলে তা দর্শক মনোরঞ্জনের উপকরণ হয়ে উঠতে পারে এ বোধটিরও বড় অভাব।

কোন আরট ফিলম তৈরি করা যেমন শক্ত কাজ ঠিক ততখানি শক্ত কাজ হলো কোন সার্থক কমারশিয়াল ছবি তৈরি করা। যে কোন ছবিরই মেরুদণ্ড হলো চিত্রনাট্য। সেই চিত্রনাট্যেই গলদ থাকলে চলবে কেন?

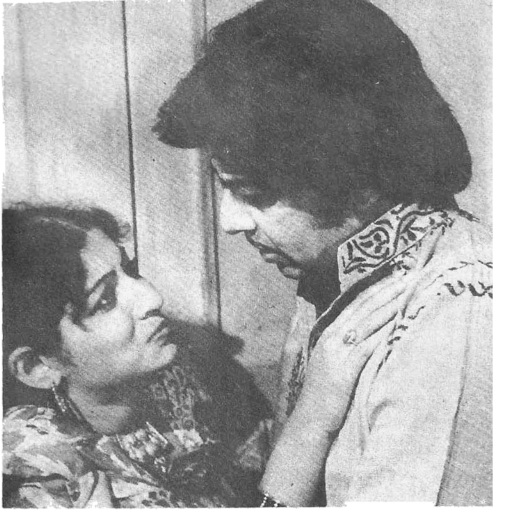
বিনয় চট্টোপাধ্যায়, নিতাই ভট্টাচার্য ও নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের পর সার্থক চিত্রনাট্য-কার জন্মালেন না বাংলাদেশে। এরা অজস্র ভালো ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন। একটা সময় তো নৃপেনবাবু একাই বাঁচিয়ে রেখে-ছিলেন টালিগঞ্জ পাড়াকে। কিন্তু তারপর সব শূন্য। এখন টালিগঞ্জ পাড়ায় সার্থক চিত্রনাট্যকার নেই বললেই চলে।

তাই দেখা যায়, বাইরে ভাল স্ক্রিপট রাইটার না থাকার দরুন অনেক অক্ষম পরিচালক নিজের ছবির চিত্রনাট্য নিজেই তৈরি করে নিচ্ছেন। এর প্রতিক্রিয়া কি হচ্ছে তা তো সবারই জানা।

গ) বোমবের অক্ষম অনুকরণ : টালিগঞ্জ পাড়া আর যাই পারুক বোমবের সস্তা ছবিগুলোর সার্থক অনুকরণ করতে পারলো না। আর সার্থক না হওয়ার দরুন তা হয়ে উঠলো ভীষণভাবে হাস্যকর অক্ষম অনুকরণ। সত্তর দশকে এ ব্যাপারটা খুবই বেড়েছে।

'অমানুষ' ছবিটি সফল হবার পর দলে দলে পরিচালকেরা ঐ জাতীয় সস্তায় বাজি মারবার এক সহজ রাস্তা খুঁজে পেয়েছিলেন। কিন্তু তারা পাননি বোমবের ছবির মত কলাকৌশলগত উৎকর্ষ। যার দরুন কোন কিছুই তেমনভাবে দানা বাঁধল না। হিন্দি ছবির দর্শকদের তো তারা পেলেনই না, উপরন্তু বাংলা ছবির নিয়মিত দর্শকদেরও তারা হারাতে লাগলেন। প্রায় সবকটি ছবিই ফ্লপ হলো ভীষণভাবে। অমানুষের' পর বোমবে এবং মাদরাজ থেকে এই জাতীয় আরো কয়েকটি ছবি মুক্তি পেয়েছিল। কিন্তু সেগুলো তেমন চললো না। কেন চললো না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে।

আসলে বাংলা ছবির নিয়মিত দর্শকেরা হিন্দি ছবির অনুকরণে বাংলা ছবি একদমই পছন্দ করেন না। তারা চান বাংলার শিল্পী নিয়ে বাংলার গল্প। মারামারি, হৈ-হট্ট-গোলের ছবি তাদের মনোমত হয় না। আবার ঐ সব বিগ বাজেটের ছবিগুলোর বিপদ হয়েছিল তারা হিন্দি ছবি দেখার নিয়মিত



''বনবাসর''./ মহুয়া. দিলীপ রায়

বাঙালী দর্শকদের মধ্যে কিছু গেলেও বিপুল সংখ্যক অবাঙালী দর্শক ঐ সব ছবি নেননি মূলত ভাষাগত কারণে।

এখন ঐ অক্ষম অনুকরণের প্রবণতা কমেছে। তবে একেবারে যায়নি।

ঘ) বৈচিত্র্যের অভাব: সব শ্রেণীর দর্শকদের মনোরঞ্জনের মত উপাদান বাংলা ছবিতে খুব কমই থাকে। দর্শকদের মধ্যে বিভিন্ন রুচির মানুষজন থাকে। কেউ শিক্ষিত কেউবা অশিক্ষিত আবার কেউ অর্ধ শিক্ষিত। এই সব ভিন্নরুচির মানুষদের আনন্দ দানের উপকরণ ক'টা ছবিতেই বা থাকে। কোন ধরনের ছবি করে সবশ্রেণীর দর্শকদের আনন্দ দেওয়া যায়, তা টালিগঞ্জ পাড়ার অনেকের কাছেই পরিষ্কার হলেও তারা তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন না।

সার্থক ব্যবসায়িক ছবি তখনই হয় যখন তাতে বৈচিত্র্য থাকে। নাটক তৈরি কি



"[illegible]"—উৎপল দত্ত

গানের ব্যবহার, সব কিছুই প্রায়শই এলোমেলো হয়ে যায় বাংলা ছবিতে।

ঙ) অনুন্নত কলাকৌশল: এখনও টালিগঞ্জপাড়ায় কাজ হয় মান্ধাতা আমলের যন্ত্রপাতি নিয়ে। নড়বড়ে ভাঙাচোরা ক্যামেরা, মরচেধরা শব্দগ্রহণ যন্ত্র এসব আজো বাংলা ছবির সঙ্গ ছাড়েনি। চট করে যে ছাড়বে তাও মনে হয় না। ভাবতেও অবাক লাগে এই আশি সালেও ক্যামেরার অপ্রতুলতার জন্য ছবির শুটিং বন্ধ হয়ে যায়।

একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে বাংলা ছবির কলাকুশলীরা অনেকেই কাজ জানেন এবং বোঝেন। আবার এর উলটোটি-ও আছে। যারা জানেন তারা সুযোগ এবং উপকরণের অভাবে যোগ্যতার সার্থক নিদর্শন দেখাতে পারছেন না। কলকাতা থেকে বোম্বাই গিয়ে অনেক কলাকুশলী হিন্দি ছবির কারিগরি দিকটিকে শাসন করে বেড়াচ্ছেন।

এত অসুবিধার মধ্যে কখনও কখনও বাংলা ছবি টেকনিক্যাল কাজে অনেককে চমকে দেয়। সবগুলো সাধারণত নামী পরিচালকদের ছবিতেই দেখা যায়। কিন্তু সাধারণ বাংলা ছবির কলাকৌশলগত মান খুবই নিম্নস্তরের। যান্ত্রিক অভাব রয়েছে ঠিকই, তবু এরই মধ্যে যে মানটুকু রক্ষা করা যায়, তাও পাওয়া যায় না। এখনও এমন চিত্রগ্রহণ করা হয়ে থাকে তা দেখে রাত্রি বা দিনের তফাৎ তেমন বোঝা যায় না। এ সব দিকে মনোযোগী হওয়া কি অবিলম্বে উচিত নয়?

চ) প্রচারহীনতা: চলচ্চিত্র ব্যবসায়ে প্রচার একটি উল্লেখযোগ্য বিভাগ। কিন্তু এর গুরুত্ব বোঝে ক'জন? বিশেষত বাংলা ছবির পরিবেশককূল এ সম্পর্কে অধিকাংশ সময়েই সজাগ থাকেন না। ফলে এক রকম প্রচারহীন অবস্থাতেই মুক্তি পায় বাংলা ছবি। নিয়ম অনুযায়ী কিছু পোস্টার, কিছু ব্যানার মুক্তি পাওয়ার আগে ঠিকই দেখা যায়, কিন্তু তা বেশিরভাগ সময়েই ছবির ব্যবসার ক্ষেত্রে তেমন কাজে আসে না।

ছবির বিষয় কিংবা এ ছবির অন্যতম আকর্ষণ কি তা ঐ সব বিজ্ঞাপনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। সুতরাং আগ্রহীরা ফাঁপরে পড়েন। ঐ সব নিকৃষ্টমানের পোস্টার বা ব্যানার দেখে এক ধারণা নিয়ে দর্শক হলে ঢুকলেন, ছবি দেখে তার সেই চাহিদা বা ধারণা সত্যি না হওয়ার জন্য নিরাশ হলেন।

ঐ দর্শকটি আরো পাঁচজনকে ছবি সম্পর্কে বললেন নিজের নিরাশ হওয়ার কথা। ঐ বাজে মন্তব্য শুনে পাঁচটি দর্শক ছবিটি দেখলেন না। আসলে ক্ষতি হলো বাংলা ছবির।

তবে আশার কথা এ ধরনের সর্বনাশা প্রচার কখনও ব্যাপক আকার ধারণ করেনি। প্রতি বছর কয়েকটা ছবির ক্ষেত্রেই এমন ঘটে থাকে। এ কথাও ঠিক যে বাংলা ছবির প্রচারযন্ত্রগুলি খুবই দুর্বল। একটু রুচিবান বা শিক্ষিত হবার সদিচ্ছা থাকলে এ ব্যবস্থার মধ্যেও প্রচার মাধ্যমগুলিকে আরো সুস্থ-সবল করে তোলা যেত।

ছ) নতুন মুখের অভাব: নতুন মুখ বা নতুন শিল্পীর অভিনয় দেখতে কারই না ভাল লাগে। হিন্দি ছবি দেখুন সেখানে নিত্য নতুন মুখের সমারোহ। অথচ বাংলা ছবি ক্রমান্বয়ে পুরনো কাসুন্দীই ঘেঁটে চলেছে। একই অভিনেতা, অভিনেত্রী, একই সুরকার, একই শিল্পীর অভিনয় এবং গান দেখতে ও শুনতে শুনতে প্রতিটি দর্শকই আজ ক্লান্ত ও বিষণ্ণ হয়ে পড়ছে।

অথচ সার্থক নতুন মুখকে স্বাগত জানাতে দর্শকেরা কখনও কার্পণ্য করেন না, এ কথাটির সত্যতা বহুবার প্রমাণিত হয়েছে।

আসলে সাহসের অভাব। নতুন প্রতিভাকে দর্শকদের সঙ্গে পরিচিত করাতে যে সদিচ্ছা ও সাহসের প্রয়োজন হয় বাংলা ছবি প্রযোজক ও পরিচালকদের মধ্যে তার অভাব খুবই প্রকট। মুষ্টিমেয় কয়েকজন পরিচালক নতুনদের সুযোগ দেবার জন্য এগিয়ে আসেন। কিন্তু ইদানীং তারাও যেন কেমন গুটিয়ে গেছেন। বহু পরিচিত পথ পরিক্রমাতেই তাদের ব্যস্ত থাকতে দেখা যাচ্ছে। এ লক্ষণটি খুবই খারাপ!

মোটামুটিভাবে এ সাতটি বিষয়ই বাংলা ছবি না চলার অন্যতম কারণ হয়ে উঠেছে।

এখন প্রশ্ন হলো, এ ব্যাপারে রাজ্য সরকার কি করতে পারেন? সরকার বড় জোর বিভিন্ন স্টুডিও এবং ল্যাবরেটরি কর্তৃপক্ষকে নতুন যন্ত্রপাতি কেনার ব্যাপারে আর্থিক সাহায্য দিতে পারেন বাকি ছটির দায় দায়িত্ব তো টালিগঞ্জ পাড়ার মানুষজনদেরই বহন করতে হবে

চিত্র পরিচালনার যোগ্যতার ন্যূনতম একটা মাপকাঠি বেঁধে দেওয়া, সব শ্রেণীর দর্শকদের কথা ভেবে কাহিনী নির্বাচন ও তার উপযুক্ত চিত্রনাট্য তৈরি করা, নতুনদের সুযোগ দান,



"চিরন্তন" / সুমিত্রা-মৃণাল

সার্থক প্রচার প্রভৃতি কাজগুলো বাংলা ছবির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদেরই তো করতে হবে। এসব কাজ তো আর রাজ্য সরকার করে দিতে পারেন না।

আসল কাজে মন না দিয়ে—'হিন্দি-ওয়ালারা সব হল দখল করে নিচ্ছে, অসম প্রতিযোগিতায় কি জেতা যায়, রাজ্য সরকারকে ছবি তৈরিতে অনুদান দিতে হবে, বাংলা ছবির ট্যাকস্ কমাও, রিলিজ চেন বাড়ানো হোক, বাংলা ছবির বাধ্যতামূলক মুক্তি চাই'—প্রভৃতি ছেঁদো কথা আর না বলে চিত্রজগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলেরই একবার অন্তত আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের প্রতিরূপ দেখার সময় এসেছে। ★

এবারের দলবদল ইতিহাস হয়ে থাকবে

শাক্যদেব

নানা কারণে আশির ফুটবল মরশুম চিহ্নিত হবে অভূতপূর্ব হিসেবে। এই প্রথম তিন প্রধান সমানভাবে এগিয়ে পিছিয়ে দল গড়েছে। এই প্রথম কোনও ক্রীড়ারসিক বা কলমচি মহামেডান স্পোর্টিংকে 'হ্যাক থু' না করে চ্যাম্পিয়ানশিপের দৌড়ে প্রথম স্থানটি দিতে না চাইলেও দ্বিতীয় স্থানে রাখতে বাধ্য। এই প্রথম কলকাতায় তিন প্রধানের কোলাকুলি হবে সেয়ানে সেয়ানে।

আপাতদৃষ্টিতে ইস্টবেঙ্গল এবার বিপর্যস্ত। কলকাতায় ভারত-পাক টেস্ট ক্রিকেট চলাকালীন ইস্টবেঙ্গলের জনৈক কর্মকর্তার মুখে শোনা গিয়েছিল সুরজিতকে দলে না রাখার সংকল্প। লীগে ইস্টবেঙ্গলকে 'গোল খাওয়ানোর' অপরাধে চিন্ময়ের ঘাড়েও ঝুলছিল বাদ দেওয়ার খাঁড়া। বাদবাকিদের দলে রাখতে কোনও 'কিন্তু' অবশ্য ছিল না ইস্টবেঙ্গলের কর্মকর্তাদের মনে। কিন্তু ওরা বুঝতে পারেননি একা সুরজিত অতগুলোকে নিয়ে ঘর ছাড়বেন। এতে দুটো জিনিস প্রমাণিত হয়। এক, দলের খেলোয়াড়দের ওপর সুরজিতের আধিপত্য দুই, কর্মকর্তাদের 'অবহেলার' প্রতিবাদে খেলোয়াড়দের একতা। যে একতা সুরজিত অ্যানড হিজ কোং এ বছর দেখালেন, প্রতিটি দলের প্রতিটি খেলোয়াড়ের মনে তা দানা বাঁধলে কলকাতায় অন্তত ফুটবলারস অ্যাসোসিয়েশন তৈরি হতে দেরি হবে না।

আমার মতে এ বছরও তিন প্রধানের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী মোহনবাগান। মোহনবাগানের ফৌজ এ বছরও একই রয়েছে গত কয়েক বছরের মতো। সেট টিমের একটা বাড়তি সুবিধে আছে। এক থেকে এগার কোনও পজিশনের খেলোয়াড়ই এবছর নতুন নয়। গতবছর মোহনবাগান যে টিম নিয়ে মাঠে নামত দরকার হলে সেই এগারজনই এ বছরও নামতে পারে। বাড়তি হিসেবে স্ট্রাইকারের জায়গায় দুজনকে নেওয়া হয়েছে—ফ্রান্সিস ও মিহির। ফ্রান্সিস কতটা কী করবে তা জানি না, তবে মিহির অন্তত মানিয়ে নেবে এবং সাতাত্তরের ফরমে ফিরে যাবে বলেই আমার ধারণা। সমর ভট্টাচার্য প্রতিভাবান হলেও ওর দলত্যাগ মোহনবাগানকে কাবু করবে না বিন্দুমাত্রও। সুব্রতর পাশে প্রদীপ চৌধুরী তো রয়েইছে, প্রয়োজনে আছে অশোক চক্রবর্তী।

দ্বিতীয় দল হিসেবে আমি মহামেডানের নাম করব। মহামেডানের সবচেয়ে লাভ হয়েছে ইস্টবেঙ্গলের সেট ফরোয়ারড লাইন পাওয়ায়। সুরজিত, সাব্বির ডেভিড তিনজনের জায়গা বাঁধা। বাকি একজন আকবর হতে পারেন। আকবর, সাব্বির দুজনেই গোলগেটার। হাফে তিনজনের প্রত্যেকেই এখন তুল্যমূল্য। সমরেশ, প্রশান্ত, অমলরাজের মধ্যে যে কোনও দুজনই যথেষ্ট। চার ব্যাকের মধ্যে দাবিদার অনেক। যে কেউ যখন তখন অপরিহার্য হয়ে উঠতে পারেন। হাফ ও ব্যাকে কে খেলবেন কে বসবেন তা নিয়ে কোচ অমল দত্তকে চিন্তিত হতে হবে নিশ্চয়। অবশ্য গোলে ভাস্কর আছেন বলে তিনি অনেকটাই নিশ্চিন্ত। কাগজে কলমে মহামেডান দারুণ হলেও একটা কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বেশি খেলোয়াড়ে দল কোনওদিনই সমৃদ্ধ হতে পারে না। তাতে লাভের থেকে লোকসানের পরিমাণই সাধারণত বেশি দেখা যায়। তাছাড়া মহামেডানের 'জল হাওয়ার' সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের 'স্টারদের' অভ্যস্ত হতেও সময় লাগবে।

ইস্টবেঙ্গলের অবস্থা এবার সত্যিই খারাপ। অন্তত দুই প্রধান প্রতিপক্ষের তুলনায়। গোটা দলে এমন দুজন খেলোয়াড় নেই যারা যে কোনও সময় খেলাটাকে ধরে খেলতে ও খেলাতে পারেন। হাবিব আর সে হাবিব নেই। নিয়মিত দলে আসতে পারবেন কিনা তা উনি নিজেই জানেন না। হরজিন্দর ভাল খেলোয়াড়। তবে উনি স্কিমার নন। ডিফেনসে মনোরঞ্জন টাফ তবে স্কিলফুল নন। সুধীর বাতিলের পর্যায় থেকে কতটা উঠে আসবেন সেটা গবেষণার বিষয়। সবচেয়ে দুর্বল তো হাফ লাইন। কে ধরবে, কে খেলাবে, কে প্রেরণা দেবে? সমস্যা ইস্টবেঙ্গলের এগারটার মধ্যে অন্তত সাতটি পজিশনে। এদের নিয়ে কোচ পি কে কী জাদু দেখান সেটাই এখন দেখতে হচ্ছে।

এ বছরের দলবদল ব্যাপক দলত্যাগের হিড়িকে যেমন উল্লেখযোগ্য ঠিক তেমনই দারুণ আরও দুটি ব্যাপারে। এই প্রথম দেখা গেল তিন প্রধানের আগের বছরের তিন অধিনায়কই দল বদল করে তিন প্রধানের এক এক দলে আসন পেতেছেন। মোহনবাগানের বিতর্কিত অধিনায়ক দিলীপ পালিত ইস্টবেঙ্গলে, ইস্টবেঙ্গলের প্রশান্ত ব্যানারজি মহামেডানে আর মহামেডানের হাবিব ইস্টবেঙ্গলে। অপর ব্যাপারটি আরও চমকপ্রদ। যে দিলীপকে নিয়ে পি কে ব্যানারজির এত কিছু হল গত বছরে, সেই দুজনই আবার একসঙ্গে প্রতিপক্ষ শিবিরে হাজির হলেন। গত বছর লীগ শেষ হওয়ার পর থেকে পি কে-দিলীপ সমাচার চাউর হয়। তারপর থেকে চলেছে দুপক্ষের কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির পালা। হঠাৎ কোন যাদুদণ্ডে সব কিছু উবে গেল? কী এমন হল যে দুজনেই পরস্পরকে মিত্র ভেবে একই দলে গিয়ে ভিড়লেন? শোনা যাচ্ছে পি কে নাকি চেয়েছিলেন দিলীপকে ইস্টবেঙ্গলে সই করার সময় 'যা বলেছি ভুল বলেছি, যা করেছি অন্যায় করেছি' গোছের একটা বিবৃতি কাগজের লোকদের দিতে হবে। দিলীপ দিয়েছেনও। ব্যস, ওতেই সব রাগ, দুঃখ, অভিমান শেষ? এতদিনকার ক্রোধ জল হয়ে গেল? অথচ গতবছর এরিয়ানের সঙ্গে শেষ খেলা শেষে মোহনবাগান তাঁবুতে দুজনে হাতাহাতি হয়নি? দুজনে দুজনকে অকথ্য ভাষায় সম্বোধন করেননি? সবকিছুই এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাওয়া যায়? আশ্চর্য। পি কে বিতর্কিত মানুষ। কিন্তু অন্য সব মানুষের মতোই তিনিও পাক্কা কেরিয়ারিসট। যে দিলীপকে অপ্রয়োজনীয় বলে তিনি বাতিল করে দিয়েছিলেন, যে সুধীরকে বুড়ো এবং প্র্যাকটিস করেনা বলে তিনি পুরো উনআশি সালটাই সাইড লাইনে বসিয়ে রেখেছিলেন তাদের ওপরই ভরসা না রেখে পি কের কি এবছর উপায় আছে?

এবছর ইস্টবেঙ্গলে দিলীপকে ধরে চারজন ব্যাক এবং দুজন স্টপার—এই দুজনের যেকোনও চারজন যখন তখন টিমে ঢোকার ক্ষমতা রাখেন। সুধীরকে যদি খেলাতেই হয় তবে রাইট ব্যাক বা স্টপার যে কোনও পজিশনেই খেলানো যেতে পারে। দিলীপের জায়গা লেফট ব্যাক। সেখানে পুরনো খেলোয়াড় রয়েছেন ম্যাথুজ ও অধিনায়ক সত্যজিৎ মিত্র। গত বছরের পি কের উক্তিকে সত্যি ধরে নিলে এভাবে চার ব্যাককে দাঁড় করানো যায়—ম্যাথুজ, মনোরঞ্জন, সমর ও সত্যজিৎ। কিন্তু তা কি হবে? দিলীপ ও সুধীর কি ঢুকবেন না? যদি ঢোকেন তাহলে অন্তত এটা বলব, কোচ পি কে গতবছরও অন্তত কয়েকটা খেলায় সুধীরকে নামাতে পারতেন আর দিলীপ সম্পর্কে তিনি যা যা বলেছিলেন তার সবগুলিই ডাহা মিথ্যে।

টাকা ছড়িয়েও টিম তৈরি করতে না পারায় ইস্টবেঙ্গল কর্মকর্তারা এখন পিঠ ও মুখ বাঁচাতে ডিসিপ্লিনের কাঁদুনি গাইছেন। বলছেন, ট্রফি নাই বা এল, ক্লাবের ডিসিপ্লিনতো থাকল। খুব হাস্যকর মনে হচ্ছে কথাগুলোকে। ডিসিপ্লিন রাখাটাই যদি ওদের এত জরুরী হয় তাহলে দিলীপ পালিত বা মহম্মদ হাবিবকে ওরা নিলেন কেন? দুজনেই কি গতবছর মোহনবাগান ও মহামেডানের ডিসিপ্লিন ভাঙেননি? দুজনেই কি ক্লাব, কোচ এবং ক্লাব কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিবৃতির বন্যা ছোটাননি? তাহলে? এসব কথা বলে লাভের কাজ কিছুই হয় না। আসল কথা সমর্থক এবং সদস্যদের ওরা যতটা বোকা ভাবেন তার অনেকগুণ বেশি বোকা ওরা নিজেরাই।

আশির মরশুমের দলবদলের পরিপ্রেক্ষিতে এই সত্যটাই তাই আবার প্রমাণিত হল, কলকাতার ফুটবলে কী হয় আর কী না হয় তা বোঝা বা তার ব্যাখ্যা করা মানুষ তো ছার—ঈশ্বরেরও অসাধ্য। ★

বারাণসীর ঘাট ও গঙ্গা

বারাণসীর ঘাটগুলিতে সময় যেন গম্ভীর হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। ঘাটগুলিই এই প্রাচীন শহরের প্রবেশদ্বার। বারাণসীর আকর্ষণ কারো কাছে ধর্ম, কারো নর্ম।

কাশীর ঘাট ও গঙ্গাতীরের ১৮টি স্কেচ বৃটিশ পেইনটস-এর ডেকর স্যার্ভিস আর্ট গ্যালারিতে (১৬-২৫ ফেব্রুয়ারি) প্রদর্শিত



হয়েছে। এঁকেছেন পৃথ্বীশ শিকদার। পৃথ্বীশ প্রধানত তেলরঙে আঁকেন। কালি, কলম, তুলির স্কেচিং বোধহয় তেল রঙের কঠোর একাগ্রতা থেকে সাময়িক আড়ভাঙার প্রয়াস। কিন্তু আড়ভাঙতে গিয়েও পৃথ্বীশ প্রচুর খেটেছেন। ফলে স্কেচগুলো উৎরেছে। রেখার স্বাচ্ছন্দ্য আছে। জড়তা একটুও নেই। নদী তীরের দৃশ্য, বজরা, রাস্তা, এঁটোকাটা জঞ্জাল, রিকসা, দূরের মন্দিরের চূড়ো, খড়কুটোর ছত্রাকার চালা, নদী থেকে ঢালু চড়ায় ওঠানো দুটি নৌকো—এ সব তার স্কেচের বিষয়। চওড়া, কখনো মোটা, কখনো সরু রেখার আঁচড়ে, ঘূর্ণির কাঠামোতে বারাণসীর দৈনন্দিন ছবিকে ধরতে চেয়েছেন পৃথ্বীশ। কিন্তু বড় নির্জন। জনশূন্য বারাণসী ভাবা যায়? নীল, হলুদ ও ছাই রঙের ছোপ মেশানো একটি লাল রঙের হনুমানের স্কেচ ছিল! স্কেচটি একটু ভিন্ন ধরনের। বৈচিত্র্য ও বিশেষত্বে বারাণসীর চিত্রণযোগ্যতা অসামান্য। প্রাচীন হলেও বারাণসী প্রাণবন্ত। এই সিরিজ সম্পূর্ণ করলে পৃথ্বীশ উল্লেখযোগ্য কাজ করবেন।

শ্যামলছায়া নাইবা গেলে

ইনডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েনটাল আরট আয়োজিত চিত্র প্রদর্শনী [বিড়লা আকাডেমি ৩০ জানুয়ারি ~১১ ফেব্রুয়ারি] একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান। এই সোসাইটি সংগঠিত হয়েছিল ১৯০৭ সালে। অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, হ্যাভেল, কিচনার, উডরোফ দেশী বিদেশী অনেকেই সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পাশ্চাত্য শিল্প শিক্ষার প্রভাবমুক্ত এবং ভারতীয় ঐতিহ্য ও পরিবেশ থেকে সংগৃহীত উপকরণ নিয়ে একটি দেশজ শিল্পশৈলী সৃষ্টি করাই ছিল সোসাইটির প্রাথমিক উদ্দেশ্য।

পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাহিনীর চিত্র, রাজস্থানী, মুঘল, পাহাড়ী ও বেঙ্গল স্কুলের সমধর্মী চিত্রের সঙ্গে সমকালীন চিত্ররীতির নিদর্শনও প্রদর্শিত হয়েছে।

সুনীল গুহের জলরঙ 'উইনটার নুন' ঘর, গাছগাছালি ও গ্রামের ছবি, সরমা ভৌমিকের নীল ও গোলাপী রঙের 'বাউল দম্পতি' ও আশিস কুমার-এর 'ওয়ান সেনটিমেনটাল ইভনিং' গ্রামের নদীতে নৌকো গলুই-এর ওপর বকপাখি, দূরে মসজিদ। ছবিগুলি ভাল। অনুকরণের চুইন চেয়ারে অনেক দূর এগোন যায় কিন্তু উঠে দাঁড়িয়ে সিঁড়ি না ভাঙলে মৌলিক চিত্র সৃষ্টি সম্ভব নয়।

গোপেন রায়ের 'পেইনটিং ১' একটি আধা অন্ধকার ঘরে রতিবিলাসী মাঝবয়সী পুরুষ নৃত্যপরা রমণীকে অনুসরণ করছে। অরুণকুমার বেরা-র 'কামারশাল' [কাগজে তেলরঙ] ও স্কেচ পেন-এ আঁকা অরুণ বণিকের বর্ণালী চিত্র 'তৃষ্ণা' মন্দ নয়। বুদ্ধি বাহাদুর থাপা-র তেল রঙের কাজ দুটি প্রশংসনীয়। রবীন্দ্রকৃষ্ণ পালের ব্লু ও রেড ল্যানডস্কেপ হিমালয়ের দৃশ্যচিত্রে ভিন্ন রঙ প্রয়োগের ফলে আকর্ষণীয় হয়েছে।

চিত্র প্রদর্শনী

আশার ছলনে ভুলি

শীতের মরশুমে কলকাতার বিভিন্ন আর্ট গ্যালারিতে অজস্র প্রদর্শনী হয়। তরুণ শিল্পীদের প্রদর্শনীর সংখ্যাই অবশ্য বেশি। পপকরন বা চিপস-এর ঠোঙা হাতে যারা আচমকা প্রদর্শনীতে এসে পড়ে তাদের কথা থাক। কিন্তু বাস্তবিক যারা শিল্প ও চিত্রকলার অনুরাগী অনেক আগ্রহ নিয়ে আর্ট গ্যালারির দেয়ালে টাঙানো চিত্রগুলি দেখার পর প্রায়ই তারা বিরস ও নিস্পৃহমুখে ফিরে যায়। শিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা এখন আর খুব শক্ত কাজ নয়। প্রদর্শনীর সংখ্যা যত বাড়ছে মনোজ্ঞ চিত্রের সংখ্যাও সেই অনুপাতে কমছে।

আকাডেমির নতুন গ্যালারিতে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে শেখর সান্যাল, দিলীপ দেবনাথ ও রবি বসু ড্রইং চিত্রের প্রদর্শনী করেছেন। অধিকাংশ চিত্রই গতানুগতিক ও বৈশিষ্ট্যহীন।

দিলীপ দেবনাথ-এর ড্রইং—একচক্ষু ডাইনির মাথায় পাখির বাসা, ওপরে একটি ঝুলন্ত বালব। রহস্য বা ভূতুড়ে ভাব প্রকাশের চেষ্টা সফল হয়নি। অপর একটি সেনটিমেনটাল ড্রইং-এ সমাজের ওপর তলার বিলাস ব্যসন যে কেবল শ্রমজীবীর কৃচ্ছ্র-সাধনেই সম্ভব হচ্ছে তা বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। রবি বসুর কোন চিত্রই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নয়। পেইনটিং ৩—অকটোপাস ছবিটি রঙ প্রয়োগকুণ্ঠ তুলির কাজ।

শেখর সান্যালের কাজ মন্দ নয়। বহু সূক্ষ্ম বর্ণরেণুর বুনোট দিয়ে তিনি ছবি এঁকেছেন। বেগনী, নীল, বাদামী, সাদা ও গোলাপী রঙ ব্যবহার করেছেন। শেখর চিত্রে একটি ভাবকে আশ্রয় করে তা পরিস্ফুট করতে চান। রিফলেকশান ৬ চিত্রে মানুষের চৈতন্যকে পদ্ম ফুলের বিকশিত রূপের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কিন্তু ছবিটিতে একটু কাঠ কাঠ ভাব আছে। ধ্যান করতে বসে প্রশান্তির বদলে যেন মরে কাঠ হয়ে গেছে মানুষটি।

রাতের আকাশের নিচে ঘর, বৃত্তাকার জলাশয়, প্রদীপ ও কাগজের নৌকোর ছবিটি রোমানটিক। নদী, পাহাড়, তারাভরা আকাশ—এক কথায় প্রকৃতি—শেখরকে বেশি টানে।

স্মৃতির ফলক

পবিত্র মুখোপাধ্যায় সুপরিচিত কবি। একটি পত্রিকার সম্পাদক। আকাডেমিতে তার প্রথম চিত্র-প্রদর্শনী (২১-২৭ জানুয়ারি) হয়ে গেল। সব ছবি তৈলাক্ত রঙীন খড়িতে আঁকা। তেলরং বা জলরঙের ছবি নেই। কারো কাছে ছবি আঁকা শেখেননি। ইচ্ছা ও আন্তরিকতাই তাকে ছবি আঁকতে উদ্বুদ্ধ করেছে। এই জন্যেই তার চিত্রে প্রত্যক্ষ অনুভূতির ছোঁয়াচ লেগে থাকে, প্রশিক্ষা যুক্ত হলে যা হয়তো আরো সংহতি পেত। কবিতায় নিজেকে বহির্বিশ্বে প্রসারিত করতে চান এবং অপরের হৃদয়ের ভাষা বুঝে নেবার জন্যে দূরগামী হতেও যত্নবান কিন্তু ছবিতে পবিত্রর প্রকাশভঙ্গি অনেক বেশি অন্তর্বৃত।

রিলকে শৈশব কালকে বলেছেন, 'রাজকীয় ঐশ্বর্য—স্মৃতির রত্নকোষ'। পবিত্র চিত্রে তার শৈশবকে খুঁজেছেন। সেই শৈশবে ছিল ক্ষোভ, দুঃখ, ভয়, মৃত্যু ও স্নেহের আকুতি। দীর্ঘকাল স্মৃতির অন্তরালে জিয়ানো সেই অনুভূতিগুলি যেন পরিণত হয়ে ফিরে এসেছে।

পবিত্রর চিত্রে যা প্রথমেই চোখে পড়ে তা হচ্ছে রেখার সরলতা। রঙ প্রয়োগের ব্যাপারেও সাবলীলতা লক্ষণীয়। অনেক ছবিতে ছুঁচ দিয়ে চেঁচে রঙের দ্যুতিকে ম্লান করতে চেয়েছেন শোভন 'মৃত্যু' ছবিতে মৃত্যুর ভয়াবহতা অনুপস্থিত। মৃত্যু সম্পর্কিত আরো কয়েকটি ছবি ছিল। 'পিয়ারিং টু ডেথ' ছবিতে স্বকীয়তা আছে। 'স্টিলনেস ইন টারময়েল' বর্ণালী ঢেউ-এর মধ্যে একটি লাল রঙের গাছ, নারীমূর্তি ও নীল আকাশ

প্রণব নাগ

নাট্য-সমীক্ষা

পার্থর ও স্কাইল্যাব

প্রযোজনা : গজল। **নাটক :** বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়। **নির্দেশনা :** শংকর ভট্টাচার্য/ অপূর্ব দেবনাথ। **অভিনয় :** শিশির মঞ্চ, ৮ মার্চ ১৯৮০।

গ্রুপ থিয়েটার হিসেবে চিহ্নিত হবার জন্যে এবারে বোধহয় কিছু মাপকাঠি প্রবর্তন করবার দরকার হয়ে পড়ছে। শ' আড়াই টাকা খরচ করে শিশির মঞ্চ বা মুক্ত অঙ্গন ভাড়া করলাম; পাড়ায় ধরে করে কিছু টিকিট বিক্রি করলাম, খবরের কাগজে আর পত্রিকার অফিসে সমালোচনার আবদার করে চিঠি লিখলাম, আর কয়েক দিন আউড়ে নিয়ে দুটো একাঙ্ক নামিয়ে ফেললাম—এতে অনেক ঘাম ঝরানো পরিশ্রম, অনেক সনিষ্ঠ নাট্যমনস্কতার বিনিময়ে পাওয়া গ্রুপ থিয়েটারের মিছিলে শরিক হওয়ার অধিকার বর্তায় না। গ্রুপ থিয়েটারের খেরো খাতায় 'অভিনয়ের' পরিচ্ছেদটি অনেক পরে, খাতার প্রথম পাতাটি নির্দিষ্ট আছে 'নিষ্ঠার' জন্যে। অকারণে নির্ধারিত সময়ে নাটক শুরু না করা এবং মঞ্চের দুধারে দুই প্রম্পটারের তীব্র চিৎকার ঐ খাতায় খুঁজে পাবার কথা নয়। দু একজনের মোটামুটি অভিনয় দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও সেদিন প্রায় সকলকে মঞ্চে অসহায় থাকতে হল, সংলাপ হাতড়াতে উইং-এর আশেপাশে ঘুরতে হল, এমন কি প্রম্পটার উচ্চারিত সংলাপগুলির কোনটি কার বুঝতে না পেরে নিজের নাম ডেকে-উঠতে হল আর বারবার হোঁচট খেতে হল : সবই নির্দেশনা ও নিঃস্বণে সম্যক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার অভাবে। দলের নাম 'গজল'-এর বর্গীয় 'জ' এর নিচে হসন্ত বসাবার মত তাই সবকিছুই হয়ে পড়ল অর্থহীন।

বিপ্লবকেতন চক্রবর্তী

গাব্বু খেলা

প্রযোজনা : নিউ থিয়েটারস গ্রুপ। **নাটক/নির্দেশনা :** দীপেন্দ্র সেনগুপ্ত। **মঞ্চ :** নিতাই ঘোষ। **আলো :** চিত্র সরকার। **সঙ্গীত :** ফাল্গুনী সেনগুপ্ত। **আবহ :** শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়। **অভিনয় রজনী :** ২৪ মার্চ ১৯৮০, আকাডেমি অব ফাইন আরটস মঞ্চ।

একই মানুষ গাব্বু গাণ্ডর মধ্যে এসে দ্বিতীয় একটি সত্তা খুলে ধরে এবং সত্যি বলতে কি সেই সত্তাটি তার নোংরা কিন্তু সত্যিকারের চরিত্র। চাঁদের উলটোপিঠের মত তাকে আমরা কোনদিনই দেখতে পেতাম না, যদি না কাঠি মিস্তিরের হাতে ঐ দেব-প্রেরিত চকখড়িটি না থাকত। কাঠি মিস্তির এক কানাগলির ডাসটবিনের পাশে মাতাল অবস্থায় আটকে পড়ে প্রায় বিশ্বরূপ দর্শন করল। সেই বিশ্ব দর্শনের চলৎ ছবিতে এসে পড়ল হারাণ মণ্ডলও, জীবিকায় কৃষক—কিন্তু তার কোন লুকানো সত্তা নেই। সে একাই ঈশ্বরের মত এক এবং অদ্বিতীয়। কাঠি মিস্তিরের ভঙ্গুর মূল্যবোধে সে এনেছে বিশ্বাস ও অস্তিত্বের প্রতি মমতা।

অসাধারণ ব্যঙ্গের ভঙ্গিতে দীপেন্দ্র সেনগুপ্ত এ নাটকেও তার পুরনো প্রতিভা প্রমাণ করেছেন। কাঠি মিস্তিরের অসাধারণ পরিশ্রমী ও কুশলী অভিনয় দেখতে দেখতে একসময় মনে হয় সে যেন এ নাটকের একমাত্র সচেতন দর্শক এবং প্রেক্ষাগৃহের দর্শকরা যেন সকলেই গাব্বু খেলার অভিনেতা হয়ে উঠেছেন। নাটকের সার্থকতার চাবিকাঠি সেখানেই।

আলো, সঙ্গীত এবং আবহ নাটকের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠেছে আর একাত্ম হয়ে গেছে আপাত সরল অথচ কঠিন মঞ্চ পরিকল্পনা।

কাঠি মিস্তির যখন সাহিত্যিকের ফেলে যাওয়া মানিব্যাগ নিয়ে দৌড়োচ্ছে তখন আলোর গুণেই তা হয়ে উঠছে ভীষণ ভাবে আক্রমণাত্মক। চকিতে মনে পড়ে যায় 'অযান্ত্রিকের' কথা। যেখানে ড্রাইভার ব্যর্থ প্রেমিকার জন্য রেলের কামরার সঙ্গে সঙ্গে 'আপনার টিকিট' বলে দৌড়োচ্ছেন। তথাকথিত ভাবালু শিল্পের প্রতি এ দুটিই তীব্র কশাঘাত। অর্থাৎ বেঁচে থাকার প্রমাণ।

এই কশাঘাত করতে করতে দীপেন্দ্র সেনগুপ্ত অবশ্য একটা সময় খেই হারিয়ে ফেলেছেন। সমাজের যাবতীয় মুখোশ একটি মাত্র নাটকে খোলা যায়না। একজন শক্তিমান নাট্যকার ও নাট্য পরিচালক হিসেবে দীপেন বাবু এ কথাটা একটু ভাববেন আশা করি।

এ রকম নাটকে যেটা দরকার তা হলো গোষ্ঠীবদ্ধ অভিনয়। নিউ থিয়েটারস গ্রুপ দাপটের সঙ্গে প্রমাণ করেছেন সেটা তারা জানেন।

যীশু চৌধুরী

মুদ্রাকর ও প্রকাশক অরুণকুমার পাল কর্তৃক ইত্যাদি প্রকাশনী (প্রাঃ) লিমিটেড প্রেস, ৭৭/২/১ লেনিন সরণি, কলকাতা ৭০০০১৩, (ফোন ২৪-৫৫২০), হইতে মুদ্রিত ও ইত্যাদি প্রকাশনী (প্রাঃ) লিমিটেড, ৪৭ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭২, (ফোন ২৭-৩৩১৬, ২৭-২১৬৯) হইতে প্রকাশিত


আবিদ সুতি
সুজা
১৭
সাতপাক ঘোরানো হতেই বর মারা গেল।
মরে গেল যে !
ঈশ্বর ওর আত্মাকে শান্তি দিন।
বিন্দুর চিতায় তোলা হল মুদির ছেলেকে।
কিছুক্ষণের মধ্যেই দেহটা ছাই হয়ে গেল।
ভোর হতেই সুজা চলল তার ডেরার দিকে।
সুজা !
এ কী দশা হল আমার !
এ ছাড়া তোমাকে তো বাঁচাতে পারতাম না।
বাঁচালে যখন, আমাকে আশ্রয় দাও।
আমি !
তোমার-আমার ঈশ্বর ও আদর্শ একই হোক।
দুজনে বন্ধুর মত এক সঙ্গে থাকব।
কাতর অনুরোধ সুজা ঠেলতে পারত না।
কিন্তু তোমার বাবা-মা ?
তারা কী বলবে ? বিয়ের পর মেয়েরা তো স্বাধীন।
নতুন দিনের ভোরে ওরা শুরু করল নতুন জীবন।
(শেষ)

PARIBARTAN, 16 April 1980, Registration No 32815/78, Postal Registration No. WB/CC–380, Rs. 1.50



আলোকচিত্র ঃ দীপঙ্কর ভট্টাচার্য